
প্রতিদিন
৩ জানুয়ারি ২০১০
রবিবার
ডায়রি
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



অঞ্জলি
জুয়েলার্স
সবার জন্য
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২ | শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬ | সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ | বারাসাত - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান রাত ৮.০০ পর্যন্ত খোলা।
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়। সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
জুয়েলারী ইনসেন্টিভ স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা
বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাস টাকা জমালে
১ মাস ফ্রি !!
* শর্তাবলী প্রযোজ্য।
www.anjali.bz
Mayurakshi/277/09

প্রতিদিন

রোববার

প্রচ্ছদ : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



তিন বছরের পুরনো। কথাটা অদ্ভুত শোনায়, না?

তবে রাত পোহালেই যদি বাসি হতে পারে, ঠিক রাত বারোটার ঘণ্টাটা বাজলেই যদি একসঙ্গে ইতিহাস হয়ে যেতে পারে তার আগের ৩৬৫ দিনের প্রতিটি মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড, তা হলে তিন বছরটা তো অনেক বড় সময়।

শুরুর দিন থেকে আজ অবধি 'রোববার' প্রায় যেন তেমনই আছে।

কতগুলো চেনা বিভাগ, এক প্রত্যাশিত পাতা ওল্টানোর যাত্রা।

আমাদের ভাল কাগজ নেই, ছাপা চমৎকার নয়। ফলে কাগজটাকে সবসময় যে মননশীলভাবে নয়নাভিরাম করতে পেরেছি, তা নয়।

এ ত্রুটি আমাদের দিনের পর দিন পীড়া দিয়েছে—কিন্তু সীমিত শক্তিতে এর বেশি কিছু আমরা দিতে পারিনি সারা শহর এবং অধুনা শহরের বাইরে কিছু কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আমাদের বিশাল 'রোববার' পরিবারকে।

আমাদের সম্বল ছিল বা আছে কিছু উজ্জ্বল গদ্য। এবং যে কোনও বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি সাজাবার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহস।

প্রত্যেকবার যে আমাদের সাহস আমাদের নিজেদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে, তা বলছি না।

কিন্তু বাঙালির জীবনে প্রোথিত নানা ছোট, খাটো, অকিঞ্চিৎকর উপাদান, যাদের কোনও এক ধারাবাহিকতার মধ্যে ফেললেই হয়তো রচিত হয় সামাজিক ইতিহাস, সেই উপাদানগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখার কথা ভেবেছি আমরা—আমাদের চটি ম্যাগাজিন কতটুকুই বা ধারণ করতে পারে? হয়তো এই সব সূত্র থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে আরও সুগভীর, আরও বিস্তৃত কোনও কাজ হতে পারে।

তিন বছর সময় পেয়েছিলাম একটু একটু করে সংসার পাতার জন্য, এবার বাড়ি সাজানোর পালা।

না না, তা বলে মসৃণ কাগজ, বাহারে ছবি—কিছুই আশা করবেন না। তবে কাজটা হয়তো আরেকটু সুষ্ঠু, আরেকটু ছিমছাম হবে। রোববারটা ২০১০-এ হয়তো বা আরেকটু স্মার্ট দেখাবে—এটাই আমাদের ভাবনা।

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁর খুশবু এবার থেকে 'রোববার'-এর পাতায় নিয়মিত পাবেন না। খাবারদাবার যদি আসে, মাঝে মাঝে হয়তো বা ফিরে আসবে অন্যান্য ভাবে বা চেহারায়।

নতুন সাপ্তাহিক কলাম লিখছেন সমরেশদা (মজুমদার) 'কলিকাতায় নবকুমার'-এর পর 'রোববার'-এর পাতায় দ্বিতীয় ধারাবাহিক। সুদূর নির্বাসন থেকে নিয়মিত কলাম লিখবেন তসলিমা নাসরিন। সঙ্গে ছবি আঁকবেন নিয়ম করে।

বাণীদি (বসু) শুরু করেছেন 'অষ্টম গর্ভ'-র সিকোয়েল (sequel) এবার 'রোববার'-এর পাতায়। আর ইতিহাসনির্ভর একটা থ্রিলার উপন্যাস লিখছেন রূপক সাহা।

তা ছাড়া আরও অনেকগুলো নিয়মিত কলাম, কোনওটা সাপ্তাহিক, কোনওটা ষান্মাসিক, কোনওটা আবার মাসে একবার করে। আপাতত এইটুকুই।

তারপর একসময়ে যেমন ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে নদী হয়, ক্ষুদ্র অঙ্কুর হয়ে ওঠে পুষ্পপত্রশোভিত মহীরুহ, আশা করা যাক না কেন, কালক্রম আমাদের ধীরে ধীরে পৌঁছে দেবে কোনও এক বিশাল ভবিষ্যতের দিকে।

২০০৬-এর ডিসেম্বর-এ 'রোববার'-এর জন্ম। ২০১০-এর জানুয়ারিতে সেই শিশু নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা অলিম্পিয়ান চাই না, সুস্থ স্বাভাবিক একজন সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে 'রোববার' তার স্বাধীনতার নানা গলিঘুঁজি খুঁজে পাক এই শহরের বুকেই।

যেমন আমরা সবাই খুঁজছি।

২০১০ আমাদের সকলের সেই সম্মিলিত ইচ্ছেকে প্রাণ দিক।
হ্যাপি নিউ ইয়ার!



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়


আউটিং
কলেজ রিইউনিয়ন
morning walk
ছোট গাড়ি
customs check
ওয়েটিং রুম
ক্লাব
পাঞ্জাবি-পাজামা
pay commission
নিউজ় চ্যানেল
leave application
প্রমোশন
recession
ডায়েটিং
ফ্যামিলি ম্যান
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
inflight magazine
হাওয়াই চটি
low-cost airline
বাজেট হোটেল
নো স্মোকিং
montblanc
দূরপাল্লার ট্রেন
পেপারব্যাক
বোর্ড মিটিং
ফরেন ট্রিপ
extra lock
ইন্টারনেটে বুকিং
টিকিট
ট্র্যাভেল এজেন্ট
yoga
মিটিং
শেভিং কিট
সাইট সিয়িং
ফরেন ট্রিপ
প্রেশারের ওষুধ
ফ্যাক্টরি ভিজ়িট
বউ-এর গিফট
জেট ল্যাগ
emi
প্যাকেজ হলিডে
অফিসার
potbelly
ট্যুর
ছেলের অ্যাডমিশন
স্যুট-টাই
চালশে
overnight
planner
Sreeleathers
bags and more
আমার ফেভারিট!
13744 Rs 4995
LADIES BAGS | CLUTCHES | PURSES | MAKEUP BOXES | JEWELLERY BOXES | TOILET BAGS | SHOPPING BAGS | TRAVEL BAGS | STROLLEY BAGS
SCHOOL BAGS | SPORTS BAGS | WAIST POUCHES | BELTS | WALLETS | BRIEFCASES | PORTFOLIOS
KOLKATA | LINDSAY STREET ~ 2286 1511 | FREE SCHOOL STREET ~ 2286 1506 | COLLEGE STREET MARCAS SQUARE ~ 2219 7984 | BEHALA MARKET ~ 2468 1341
GARIA BASU MARKET ~ 2430 3076 | HOWRAH | CORPORATION STADIUM COMPLEX ~ 2641 0608
DOMJUR | NAIHATI | BOKARO | GAYA | DURGAPUR | ASANSOL | BERHAMPUR | PURULIA | JAMSHEDPUR | DHANBAD | RANCHI | HAZARIBAG | BHAGALPUR
MUZAFFARPUR | PATNA | CUTTACK | BHUBANESWAR | AGARTALA | VARANASI | RAIPUR | GUWAHATI | DELHI
ResponseIndia.Com



শুরু হল নতুন কলাম। পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

সক্রেটিস জুতো পরতেন না। তবে সেদিন চানটান করে, পরিপাটি চুল আঁচড়ে জুতো পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। বিরল দৃশ্য বটে। কিছু দূরে একই রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটছেন বেঁটেখাটো সাধারণ মানুষ অ্যারিস্টোডিমাস। সক্রেটিসকে এমন ফিটফাট দেখে তিনি অবাক। কৌতূহল চাপতে পারলেন না। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এত সেজেগুজে চললেন কোথায়?'

'আগাথন-এর ডিনার পার্টিতে যাচ্ছি। প্রথম ট্র্যাজেডিটা লিখেই তো পুরস্কার পেয়েছে আগাথন। গত রাতেও সেলিব্রেশন-পার্টি ছিল। কাল যেতে পারিনি। আজ না গেলে খারাপ দেখায়। সাজগোজ করেছি আগাথনের জন্যই। ও আবার পারিপাট্য ভালবাসে। তুমি যাবে না কি আমার সঙ্গে?'

'আপনি যা আজ্ঞা করবেন তা-ই করব।'

'মনে রেখো, আগামেমননের পার্টিতে তার ভাই, স্পার্টা-র রাজা, হেলেনের স্বামী মেনিলিয়াস কিন্তু নেমতন্ন পায়নি। তা-ও তো গিয়েছিল। বিখ্যাত ব্যক্তিদের পার্টিতে সাধারণ মানুষ অনাহূতও যেতে পারে। তাতে লজ্জার কিছু নেই।'

'আমি তো সাধারণেরও সাধারণ, সম্পূর্ণ পরিচয়হীন। ওইরকম বিখ্যাত ব্যক্তিদের পার্টিতে আপনি আমার কী পরিচয় দেবেন?'

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ঘটনা। ভাগ্যিস সেদিন সক্রেটিসের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল অ্যারিস্টোডিমাসের। এবং ভাগ্যিস অ্যারিস্টোডিমাসকে সেদিন সঙ্গে করে আগাথনের 'সিম্পোজিয়াম'-এ নিয়ে গিয়েছিলেন সক্রেটিস। 'সিম্পোজিয়াম' মানে এ-যুগে আমরা বুঝি গোমড়ামুখে গভীর আলোচনাচক্র। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিকদের 'সিম্পোজিয়াম' ছিল প্রচুর মদ্যপান-সহ আলোচনাসভা। আলোচনার বিষয় যতই গুরুগম্ভীর হোক না কেন, উল্লাসও কিছু কম থাকত না। আগাথনের পার্টিতে সেদিন ঠিক কী হয়েছিল, কারা উপস্থিত ছিলেন, কী ছিল আলোচনার বিষয়, এবং কে কত পান করেছিলেন, ব্যক্তিগত কেচ্ছা, সব বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে ওই পার্টিতে অনাহূত অ্যারিস্টোডিমাসের কাছে। তাঁর এই বয়ান পাওয়া যায় প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম'-এ, যেখানে ধরা আছে এই প্রাচীন, তারকাখচিত পার্টির অনুপুঙ্খ। এমন ব্যাঙ্কোয়েট বর্ণনা এ-জীবনে আর তো পড়িনি। তীব্র যৌন-তাড়না, গোপন জীবন, এবং হাটে হাঁড়িভাঙা—সব আছে সিম্পোজিয়াম-এ। এমন ব্যাঙ্কোয়েট এ-যুগে সম্ভব নয়। সে-সাহস নস্যাৎ করেছে আমাদের আটপৌরে নীতিবোধ। 'সিম্পোজিয়াম' প্রথম পড়ি ছয়ের দশকে, ছাত্রাবস্থায়। তারপর কতবার যে ফিরে গিয়েছি প্লেটোর এই বইটির কাছে, বিদগ্ধ মাতলামি থেকে ছিটকে পড়া রত্নভাণ্ডার



লুঠতে। কেউ-কেউ ঈষৎ রঙিন। কেউ আবার পাঁড় মাতাল। ব্যাঙ্কোয়েটে উপস্থিত নাট্যকার আগাথন, সমকামী আগাথনের পুরুষ-প্রেমিক পৌসানিয়াস, আদর্শবাদী দার্শনিক ফ্রিড্রাস, চিকিৎসক এরিক্সিম্যাকাস, ব্যঙ্গাত্মক, কৌতুকপ্রদ নাটকের ভুবনবিখ্যাত লেখক অ্যারিস্টোফেন্স, প্রেবয় আলসিবিয়াডিস এবং স্বয়ং সক্রেটিস! এবং এঁদের উদ্বুদ্ধ মদিরতার পরম প্রকাশ ঘটেছে প্রেম-সম্পর্কে ক্রমশ অভিনব আলোচনায়! রোম্যান্টিকতা বর্জিত খাঁটি যৌনতা নিয়ে এমন তুরীয় আলোচনার কাছে বারবার ফিরে না গিয়ে সত্যি উপায় নেই।

এই আলোচনায় প্রথম চমকে দিচ্ছেন অ্যারিস্টোফেন্স। অকপটে বলছেন 'থার্ড সেক্স' বা দ্বিলিঙ্গের কথা—যে-মানুষটি একই সঙ্গে পুরুষ এবং নারী। এই হার্মাফ্রোডাইট (hermaphrodite)-দের বুঝতে হবে আমাদের, পরিষ্কার জানাচ্ছেন অ্যারিস্টোফেন্স। কী চমৎকার ভাগ করেছেন তিনি প্রেমের! কিছু পুরুষ, যারা নারী দেখলেই ছোঁক-ছোঁক করে, হাত বাড়ায়, ক্রমাগত নারীকে নানা ছলেবলে কাছে টানে—এরা 'উওম্যানাইজার'। এদের মধ্যেই পাওয়া যায় অধিকাংশ পুরুষকে যারা পারঙ্গম-অগম্যাগমনে। সেই নারীদের কথাও বলেছেন অ্যারিস্টোফেন্স, যারা পুরুষ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে বিছানাপ্রবণ হয়ে ওঠে, নিজেদের সামলাতে পারে না। এরা নিম্ফোম্যানিয়াক্স (nymphomaniacs)। এবং এরাই পরপুরুষ-গমনে সদা আগ্রহী, উত্তেজিত। এই দুই জাতের নারী পুরুষের প্রেমের তুলনায় অনেক খাঁটি দুই সমকামী নারীর পারস্পরিক প্রেম, এমন সংকেতও দিয়েছেন অ্যারিস্টোফেন্স তাঁর ব্যাঙ্কোয়েট-ভাষণে। এরা 'লেসবিয়ান্স', নারী হয়েও এরা শুধু নারীর প্রতিই আসক্ত হতে পারে, পরিষ্কার জানালেন এই বিখ্যাত নাট্যকার। কিন্তু আরও উঁচুদরের প্রেম পাওয়া যায় শুধুমাত্র সমকামী পুরুষদের মধ্যে—দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেন এই সাহিত্যিক। সমকামী পুরুষরা ভালবাসে তাদের শয্যাসঙ্গী হিসেবে প্রেমকামী তরুণদের। কোনও অন্যায় নেই এ-হেন সম্পর্কে। এরা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এরা দ্রব হয়ে যায় পরস্পরের মধ্যে, এরা আর দুই থাকে না, হয়ে যায় একাকার। এদের যৌনসম্পর্ক এতই নিবিড় যে বিয়ে করে এদের পরস্পরকে আটকে রাখার প্রয়োজন হয় না। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এক ব্যাঙ্কোয়েট-ভাষণে এ-কথা বলতে পেরেছিলেন এক নাট্যকার। পার্টি যখন জমজমাট, এবং মোটামুটি সবাই অল্পবিস্তর টালমাটাল, সক্রেটিস উঠলেন বলতে। সক্রেটিস, যিনি প্রচুর পান করেও মাতাল হন না কখনও। প্রেম সম্পর্কে সক্রেটিসের বক্তব্য শুনতে সবাই উদগ্রীব। কিন্তু সক্রেটিস টানা ভাষণ দেননি। আগাথনের সঙ্গে আলোচনা করতে-করতে মণিমুক্তো ছড়িয়েছেন। যেমন, প্রেম সম্পর্কে আমি কোনও 'হয়তো'-তে বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি নিশ্চয়তায়। যেমন, প্রেম নিজে সুন্দর নয়, তা-ই সুন্দরকে খোঁজে। যেমন, যা সুন্দর নয় তাই অসুন্দর, এমন ভাবা ভুল। সক্রেটিসকে প্রেমে দীক্ষিত করেছিলেন দিওতিমা নামের এক মহিলা। দিওতিমার প্রেম-দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সক্রেটিসের বক্তব্যের নির্যাস। কিন্তু সেই জটিল প্রসঙ্গ থেকে এখানে সরে যাচ্ছি এক বর্ণিল কেচ্ছাকে জায়গা ছেড়ে দিতে।

আলোচনাসভায় ঢুকলেন বেহেড মাতাল আলসিবিয়াডিস। এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। বললেন, আমি সক্রেটিসের প্রেমে পড়েছি, তাকে চেয়েছি শারীরিক সম্পর্কে। কী করে পাওয়া যায় তাকে? মতলব করে একদিন তাকে ডিনারে ডাকলাম। এরপরের কাহিনি যারা হজম করতে পারবে না, এখানে যারা ক্রীতদাস বা অশিক্ষিত লোকজন আছ, তারা কানে আঙুল দাও। ডিনারে কথা বলতে-বলতে, খেতে-খেতে, পান করতে-করতে রাত বাড়ল। একে-একে দীপ নিভে গেল। ভাবলাম এই সুযোগ। সক্রেটিস সেই রাত্রে আমার বাড়িতেই ছিল। আমি তার বিছানায় গেলাম। সেটা ছিল শীতকাল। আমি সক্রেটিসের পাশে শুয়েই ওকে আমার জোব্বার মধ্যে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, জাপ্টাজাপ্টি করে আদরের চেষ্টা করলাম, কিন্তু সক্রেটিস আমার আলিঙ্গনে সাড়া দিল না। আমি সক্রেটিসের কর্কশ পোশাকটার তলায় ওকে আঁকড়ে ধরে সারারাত কাটালাম। সকালবেলা মনে হল যেন বুড়ো বাপের সঙ্গে শুয়ে আছি। এই অপমানের একদিন না একদিন আমি প্রতিশোধ নেবই।

এরপর প্রতিশোধের আর বাকি থাকল কী!

সিম্পোজিয়াম ● প্লেটো



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল

হ্যাপি নিউ ইয়ার! হুড়মুড় করে এসে গেল যে আসার। নতুন শতাব্দী আসতে না আসতেই এক দশক হয়ে গেল তার? আমাদের বয়েসের আর রাশ টেনে রাখা যাচ্ছে না যে? যে বাচ্চাটা সেদিনই ছিল গর্ভে সে আজ প্রাইমারি ইশকুলের পালা চুকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের দেশের অবস্থান আর পাল্টাল কই? অনেক দাগা দিয়ে গিয়েছে পুরনো কয়েকটা বছর, কিছু কিছু উপঢৌকনও যে দেয়নি তা নয়। ক্ষতির তুলনায় প্রাপ্তিটুকু মনে হয় যৎসামান্য। মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। সন্ত্রাসে, বিচ্ছিন্নতার উদ্বেগে ছন্নছাড়া দেশ। কে যে আপন, কে পর, কাকে বিশ্বাস করব, কিছুই আর ঠিকঠাক নেই। নববর্ষ—না, নতুন বছর, আমাদের সর্বজনের জীবনে মনে স্বস্তি আনুক, মঙ্গল নিয়ে আসুক। পয়লা জানুয়ারিকে 'নববর্ষ' তো বলা যাবে না, ওটা আমার মনের মধ্যে বৈশাখ মাসে আটকে আছে। পাখা ঘুরছে, ঘাম ঘাম, কড়া রোদ্দুর, ছায়ার রং ঠান্ডা, কাঁচা আম পোড়া সরবত, সন্ধেবেলায় জুঁইফুল-বেলফুলের বাস নিয়ে আসছে দখিনা বাতাস, সেই বাতাসে হাসছে রবি ঠাকুরের গান—সেইটে নববর্ষ। তা থেকে নড়চড় নেই। অথচ জানুয়ারি মাসটাকেই আমার নিজের অন্তত আসল নববর্ষ মনে হওয়া উচিত ছিল, এটাই তো আমারও নশ্বর জীবনের প্রথম মাস। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই আমার হাত ধরেছে নতুন বছর। গোড়া থেকেই বছরটার সঙ্গে আমার মাখামাখি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর জন্মমুহূর্তেই পৌষলক্ষ্মী আমাকে পিঠে-পায়েস খাইয়ে স্পয়েল করেছেন। সেই মাসটা এসে গেল, অথচ ডায়রি এল না একখানাও। নতুন বছর না পড়লে ডায়রিদাতাগণ কেউ ডায়রি প্রদানের কথা ভাবেন না, অথচ এই অভাগাদের সব সম্ভাব্য কর্মব্যস্ততার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো অনেক আগে থেকেই সারিবন্দি হয়ে যায়। আমি সেসব যত্রতত্র লিখে রাখি, ঠিক মনে থাকবে, এই অসম্ভব কল্পনায়। তারপরে আর খুঁজে পাই না। আপনারা কেউ যদি আগে থেকে আমার সঙ্গে ২০১০-এর জন্য কোনও ডেট ঠিক করে থাকেন, ভুলে যান। কেন না আমি ভুলে গিয়েছি, যেহেতু আমার হিসেব রাখার খাতা নেই। অনেকে টেলিফোনে এসব নোট করে রাখতে পারেন, আমার সেই পারঙ্গমতাও নেই। জানি, নতুন বছর এসে গেলে আসতে শুরু করবে একের পরে এক নতুন নতুন ডায়রি। যাঁরা ভালবেসে আমাদের ডায়রি দিতে চান তাঁদের উপদেশ দিই, নভেম্বরের শেষে কি লেটেস্ট ডিসেম্বরের গোড়াতে ডায়রিটা প্রদান করুন। নইলে আমরা অগত্যা একটি নতুন বছরের ডায়রি কিনেই ফেলি, সারা বছর সেটাই ব্যবহার করি। আর তারপরে আপনাদের দেওয়া অতি সুন্দর স্পেশাল-দর্শন ডায়েরিগুলো মোটা সুশ্রী বাঁধানো খাতাতে পরিণত হয়। সন তারিখের আর দাম থাকে না সেখানে। দিনলিপির কাজটা হয়ে চলে অন্যত্র।

অনেকে কম্পিউটারেই দিনলিপি রাখেন। আমার মতো উদোমার্কারা দিনলিপি রাখেই না। দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো রাখতেই হয় লিখে, তাই বাধ্য হই সেটুকু লিখতে। ক্যালেন্ডারের গায়েই লিখি। কিন্তু সেও তো পরের বছরে থাকে না। কে কবে কখন আসবেন, আমায় কবে কখন কোথায় যেতে হবে, কোথায় কোন লেখা কোন তারিখে দেওয়ার কথা আছে, আর কবে কোন বিল পে করার শেষ দিন। আমার ডায়রিতে শুধু এইটুকু। নাথিং প্রাইভেট। সাড়ে চুয়াত্তর দিব্যি দেওয়ার মতো কিছু নেই। সাহিত্যিক মূল্যও জিরো। পরের বছরের কাজকম্মো সব মৌখিক, খাতায় কলমে থাকে না। অথচ এমনও দিন ছিল যখন আমার ডায়রি-লিখন আর ফুরোতে চাইত না। এবং তাকে লুকিয়ে রাখার জায়গা খুঁজে বের করা এক কঠিন কাজ ছিল। ছোটবেলাতে মা নতুন বছরে আমাকে একটি ছোট ডায়রি দিতেন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর, নিয়মিত রোজনামচা লিখব বলে। বাড়িতে এখনও দু-একটা পড়ে আছে। একটা মলাটছেঁড়া খুদে ডায়রি উল্টোতে উল্টোতে দেখলুম একটা পাতায় রয়েছে রং-পেনসিলে আঁকা জাতীয় পতাকা, তার তলায় লেখা জয়হিন্দ! তারিখ, ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭, তাতে লেখা আছে মাঝরাত্রে পতাকা উত্তোলনের গল্প, ভোরবেলায় গান গেয়ে পথে পথে পতাকা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রভাতফেরির খুশি। ৬/৭ বছর বয়েসে মা আমাকে একটা মাঝারি সাইজের কালো মলাটের ডায়রি দিয়েছিলেন, কবিতা লেখার জন্যে। তাতেই সেই 'স্লিট ট্রেঞ্চে জল জমেছে হিন্দুস্থান পার্কে/দেখতে যাবি বাচ্চু মেরী কৃষ্ণা ধীরা আর কে' ছড়া লিখে মায়ের কাছে ছন্দের জন্যে প্রশংসা পেয়েছিলুম। ডায়রিতে কবিতা লেখার অভ্যেস অনেকেরই, আমারও সেই অভ্যেস আর যায়নি, বড় হতে হতে আমি সেই সরকার-এর ডায়রিতে কবিতা লিখেছি বহুকাল। ওই যে আমার একটা অমূল্য প্যাকেট ছিল, আজীবনের সবগুলো কবিতার ডায়রির পোঁটলা সেটা, সংখ্যায় খুব বেশি নয়। সেটা সঙ্গে করে আমি সর্বত্র

নিয়ে যেতুম, পাছে হারিয়ে যায়, দু'দিনের জন্যও কাছ ছাড়া করতুম না। জীবনের সবচেয়ে দামি সম্পত্তি আমার। তারপর কবে যেন একটা এলোমেলো সময়ে যখন কোনও সম্পত্তিরই আর কোনও দাম রইল না, কে জানে, কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে।

বড় বড় বিদেশি খাতাতে হাতে করে তারিখ দিয়ে, দিনদুপুর নেই রাত দুপুর নেই, যখন তখন বসে যেতুম দিনলিপি লিখতে। মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছে করত, দুর্নিবার তাগিদ বোধ করতুম কথা কইবার, কিছু কিছু কথা ভাষায় উচ্চারণ করার। কবিতা লেখা এক, আর দিনের শেষের আয়নায় মুখ দেখা আর এক। ডায়রি তো আয়না আসলে। ভিতরের মুখটার আয়না। মনের সব অবাক চোখ, সব ভ্রূকুটি, সব আকুলিবিকুলি সেইখানে ধরা পড়বে। কোথাও ছিল সেইসব খাতা। কিন্তু দরকারি জিনিসপত্তর ঠিকমতো জমিয়ে সযত্নে গুছিয়ে রাখার স্বভাব ছিল না আর। এখনও কিছু খাতা ইধার-উধারসে টুকটাক বেরিয়ে পড়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে মাঝে মাঝে। বাইরে থাকার সময়ে লেখা, একাকিত্ব যখন প্রবল, মনের কথার সঙ্গী তখন খাতা। কিন্তু আমাতে আমি ফিরে এলেই ডায়রির প্রয়োজন শেষ। চারিদিকে এত লোক, এত কথা, কথা বলতে বলতেই সব অন্তরের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, জনারণ্যে হারিয়ে যায় ভিতরের মানুষ। শুধু ডায়রি তাকে চেনে।

বাংলাতে মেয়েদের ব্যক্তিগত দিনলিপি লেখার চর্চা এইভাবেই শুরু, বুকের মধ্যে কথা জমে উঠছে, বলার মানুষ নেই। খাতাই সেই ধৈর্যশীল শ্রোতা। আমার মায়েরও অভ্যেস ছিল ডায়রি লেখা। মায়েদের সময়ে একরকম মাঝারি বইয়ের মাপের ডায়রি হত, সেও বোধ হয় 'সরকারস ডায়রি', আমার খুব মজা লাগত, তাতে একটি খামের মুখের মতো তেকোনা ফ্ল্যাপ থাকত, যেটি ভাঁজ করে টিপ-বোতাম আটকে ডায়রিটা বাক্সবন্দি করে ফেলা যেত গোপনীয়তা সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু চাবি লাগানোর ব্যবস্থা ছিল না। ধরেই নেওয়া হত বন্ধ খাতার বোতাম খুলে কেউ উঁকি মারবে না। বিদেশে গিয়ে দেখেছি ছোট-বড় নানা ধরনের ডায়রি, তাতে ছোট ছোট তালাচাবি বন্ধ করে রাখা যায়। বিশেষত দোকানে টিনএজারদের ব্যবহারের জিনিসপত্তরের জায়গায় এই ডায়রিগুলো দেখেছি। এসব হল আসলি চিজ, গোপনকথার সিন্দুকের মতো ডায়রি। চাবি শুধু আমার কাছে। সংরক্ষিত সম্পত্তি, হাত দিবেন না। নিতান্ত ব্যক্তিগত। পরম গোপনীয়। প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল।

ডায়রি মানেই যে গোপনকথা নয়, এই এক কুশিক্ষা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং গুরুদেব। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে পরের চিঠিপত্তর আর পরের ডায়রি পাঠ করার একটা অনাবিল প্রবণতার বদ অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের। আগ্রহ এবং কৌতূহল দুইই প্রচুর। এই ধরুন আপনার ডায়রিটি হাতের কাছে পেলে সেটিকে ভুলে ভুলে খুলে পড়ে ফেলতেই পারি আমরা যে কেউ। কোনটা কখন প্রাইভেট, কোনটা কখন পাবলিক, সে নিয়ে আমাদের এই ভুবনগ্রামে অনেক তর্ক সম্ভব। অ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়রি আর জাপানযাত্রীর ডায়রি তো এক লক্ষ্যে লিখিত নয়, যেমন এক মূল্য নয় হিটলারের ডায়রি আর চে গুয়েভারার মোটর সাইকেল ডায়রিজ-এর। পাঠকের কাছে এক একটা ভিন্ন ভুবন উন্মোচিত করে দেয় এক একটি বিশেষ সময়ে লিখিত এক এক ব্যক্তির অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবনের বৈচিত্র্যময় দিনলিপি। মৃত্যুর পরে এই একদা গোপন দিনলিপিকে নানা কুকর্মেও ব্যবহার করা সহজেই সম্ভব। তিরোহিত লেখক তো আর আস্তিন গুটিয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আসবেন না! ডায়রি মাঝে মাঝে অন্যের জীবনে বেশ গোলমাল বাধায়। আমার এক বন্ধুর বাবার মৃত্যুর পরে সে দেশ থেকে ফিরে এল খুব বিচলিত হয়ে। বাবার বয়েস হয়েছিল, খুব অসুস্থ ছিলেন, সে এতটা ভেঙে পড়বে আশা করিনি। অবশেষে জানা গেল, তার বাবার ডায়রিতে সে পড়েছে তার প্রকৃত জন্মসাল সে যা জানে তার চেয়ে দু'বছর আগে। বাবা স্কুলে দু'বছর বয়েস কমিয়ে লিখেছিলেন। তার এই নিয়ে প্রচণ্ড মনখারাপ ছিল বহুকাল। সে নিজের নতুন বয়েসের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারেনি। আমার শাশুড়িমা অমিতা সেনও জানতেন তাঁর ১৯১৩-তে জন্ম, কিন্তু নিজের মৃত্যুর কিছুদিন আগে পিতা ক্ষিতিমোহন সেনের ডায়রিতে জানতে পারলেন, তা নয়, ১৯১২-তে জন্মেছেন। তখনই নব্বই, তাই তাঁর অবিশ্যি এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা দেখিনি।

এ তো একরকম গেল। আসল গোলমাল অন্যত্র। হাটে-বাজারে যে সামাজিক মানুষটিকে আমরা চিনি, আর ডায়রিতে যে অপ্রসাধিত মুখচ্ছবি উন্মোচিত হয়, অনেক সময়ে সেই বাইরের আর ভিতরের মুখ দু'টোতে আশ্চর্য অমিল সম্ভব। মুশকিল বাধে সেখানেই।

বাংলা সাহিত্য জগতে ইদানীং দেখতে পাচ্ছি এক ভয়াবহ কাণ্ড শুরু হয়েছে, তিরোহিত ব্যক্তির অপ্রকাশিত ডায়রি সাত তাড়াতাড়ি ছেপে ফেলা হচ্ছে! নাম করা একাধিক প্রয়াত ব্যক্তির স্বগত-উক্ত ডায়রি, লেখক যা ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে যাননি, বা তার জন্য আলাদা করে অনুমতি দিয়ে যাননি, তাঁদের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ছাপার হরফে উন্মোচিত করে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে। ডায়েরিতে তাঁরা যাদের বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত, ভালমন্দ মন্তব্য লিখেছেন, তারা হয়তো অনেকেই তখনও জীবিত। সেসব একান্ত ব্যক্তিগত, নগ্ন মনের গভীরে থাকা কথা, লেখক নিজের কাছে নিজে লিখছেন ডায়রির পাতায় স্নানের ঘরের মতো নিশ্চিন্ত গোপনীয়তা আছে, এই আশ্বাসে নির্ভর করে। সেইসব খোলামেলা ভাবনা, অথবা বাঁকাচোরা

মন্তব্য, অনেক সময়েই যা ইতিবাচক নয়, আমাদের মতো বাইরের লোকের শ্রবণের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই ছিল না। মৃত মানুষের এই সহসা বেআব্রু হয়ে পড়ার মধ্যে জীবিতদের দিক থেকে এক মর্মান্তিক বিশ্বাসহানি আছে। মৃতের পরিবারের বাকি সকলের পক্ষেও এর সামাজিক ফলশ্রুতি অনেক সময়েই মঙ্গলময় হয় না। ডায়রি সম্পাদনা আরেক কঠিন, জটিল কর্ম। আমি একটি ঘটনা জানি যেখানে একজন বিশিষ্ট মানুষের দিনলিপির মূল খাতায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা লাইনের পর লাইন কালি দিয়ে কেটে সম্পূর্ণ অপাঠ্য করে ছাপতে দিয়েছিলেন। একে তো বলব গর্হিত অপরাধ। পরে ছাপা হোক, অপেক্ষা করা হোক, আপাতত বাদ দিয়ে রাখা হোক, কিন্তু ইতিহাসকে মুছে দিয়ে ছাপাব কেমন করে? ডায়রির কিছু অংশ বাদ রেখে সম্পাদনা করে ছাপাতে পারি, কিন্তু মূল ডায়রিতে কলম না-ছুঁইয়ে। বলাই থাকবে এটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সম্পূর্ণটি সিন্দুকে আছে। ডায়রি প্রকাশের অজুহাত অনেকরকম থাকতেই পারে। সাহিত্যকীর্তি, সমাজতত্ত্বের নিদর্শন, ঐতিহাসিক দলিল, একটি বিশেষ সময়ের পাঞ্জাছাপ, কী নয় এই ডায়রি? আমার মায়ের তো ধোপার হিসেব, গয়লার হিসেব, বাজারের হিসেব, দৈনিক, এবং মাসিক যাবতীয় খরচের হিসেব, আর কবে কোন অতিথি এলেন, প্রমথ চৌধুরী, প্রফুল্ল সরকার, না শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেইসব হিসেব মুক্তোর মতো হরফে লেখা থাকত ওই বোতাম দেওয়া ডায়রিতে। তারই মধ্যে এক একসময়ে থাকত তাঁর বিভিন্ন



ভাবনাচিন্তা, লেখালিখির প্রসঙ্গ। একটি ছত্র ছিল আমার ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদ বিষয়েও। আমার ছোটবেলাতে দেখেছি মায়ের ডায়েরিগুলো তিনি একটি বইয়ের র‍্যাকে পরের পর গুছিয়ে রাখতেন। আমাকে কেউ বারণ করেনি, তাই আমি আবাল্য বইসদৃশ ডায়রিগুলো নিয়ে খেলা করেছি, ওই টিপবোতাম খোলা আটকানোর খেলা। খুলে খুলে পড়েওছি খুশি মতো। তাই তো জানি তাতে কী কী ছিল। সত্যজিৎ রায়ের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ডায়রি সুরক্ষা ক'জনে করেন? বছর ধরে ধরে পরপর সাজানো ডায়রিগুলো একটা মানুষের দিনে দিনে গড়ে ওঠার, বদলে যাওয়ার ছবির অ্যালবাম। মা-ও কিন্তু তাঁর ডায়রিগুলো গুছিয়ে রেখেছিলেন অনেকদিন।

একটা সতর্কবাক্য বলি। আমাদের কখনওই বিস্মৃত হলে চলবে না, যে, বাইরে থেকে একরকম দেখালেও, আত্মজীবনী লেখা আর ডায়রি লেখা শুধু আলাদা নয়, দু'টো একেবারেই বিপরীতধর্মী কাজ।

আত্মজীবনী কেউ নিজের জন্য লেখেন না।

আর ডায়রি কেউ পরের জন্য লেখেন না।

ডায়রিকে আত্মজীবনীর বিকল্পের জায়গায় বসালে খুব বড় রকমের ভুল হয়ে যাবে। আত্মজীবনীর উদ্দেশ্য জগতের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ ঘটানো, বহির্জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে নিজের কথা বলা। আর ডায়রির উদ্দেশ্য, নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো, নিজের সঙ্গে নিজের গোপনে কথা কওয়া।

এই ডায়রি লেখার অভ্যেস থাকা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি জরুরি বলে আমার মনে হয়। জীবনে এখন অনেক বেশি মুক্তাঞ্চল এসে পড়েছে, বেনো জল ঢুকে পড়ছে, ভাঙচুর চলেছে। যে কোনও বয়েসে, যে কোনও পেশায়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের জীবনযাত্রা এখন চরম স্ট্রেসফুল। জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি নিজের দিনযাপনের একটা ছবি নিজের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট থাকা। একটা রোজনামচা লিখলে সেটা কিছুটা সম্ভব। প্রায়ই দেখি আমরা অনেকে নিজেরাই মনে রাখতে পারি না পরশু দিন কি থিয়েটারটা দেখলুম, না কালই? আচ্ছা, গত সোমবারে ওরা এসিছিল, না কি এই সোমবারে? স্মৃতির অন্তত একটা রাশ থাকে রোজনামচার হাতে।

হ্যাঁ, 'ডায়রি' নাম দিয়ে কোনও রচনা যদি লেখক নিজেই পুস্তক রূপে প্রকাশ করেন, সেটা অন্য কথা। সেটি আত্মজীবনীর অন্য নাম। কিন্তু যে ডায়রি সদর বাড়িতে নাচের মুজরো নেয়নি, অর্থাৎ সর্বসমক্ষে প্রকাশিতব্য হিসেবে রচিত হয়নি, লেখকের নিজের সঙ্গে নিজের সংগুপ্ত আলাপ, কিংবা হয়তো নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, হয়তো ডিপ্রেশনের মধ্যে প্রলাপ, যা ডাক্তারের চেম্বারের আলোচনার মতো একান্তই সঙ্গোপনে থাকা উচিত ছিল, ব্যক্তিগত কথায় পরিপূর্ণ সেই সব ডায়রি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে এনে ফেললে সদ্যপ্রয়াত লেখকের কী উপকার হয়? এ তো পরচর্চা পরনিন্দার এক বিভীষিকাময়, সামাজিক, মানবিক দায়িত্বহীন বাণিজ্যিক রূপ। অতি ভয়াবহ, স্বর্গত লেখক যেখানে প্রকাশকের বলির পাঁঠা।

হঠাৎ খেয়াল হল, প্রত্যেকেরই এরকম হতে পারে। অতএব, সাধু, সাবধান। আপনি কবে ওপারে যাবেন আপনি জানেন না। ডায়রি-টায়রিগুলোর ব্যবস্থা এখনি করে ফেলুন। সতর্কতা খুব জরুরি। এমনকী আমারও ওই যে ইতিউতি হারিয়ে যাওয়া যত 'প্রাইভেট' খাতাপত্তর, এইবারে উঠে পড়ে খুঁজতে হবে। কে জানে আমি টুক করে পটল তুললেই কতজন পিএনপিসি-প্রিয় লোকজন গম্ভীর মুখে মানবীবিদ্যাচর্চার নামে সেই সব লেখালিখির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আমার ডায়রির ইউএসপি: আমি মেয়ে। তাই আমার গোপন কথার বাজারে এখন অনেক দাম। মেয়ে হলেই হল, মেয়েদের বেলায় দামি হওয়ার জন্যে নামী হওয়ার দরকার নেই। ইদানীং সারা পৃথিবী জুড়ে মানবীবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, আর সামাজিক ইতিহাসচর্চার গতি অনুযায়ী 'নিজের কথা' বলে মেয়েরা মুখে যা বলবেন, তাই সোনা দানা, আর যা লিখবেন তাই মণিমুক্তো। আমার তো আবার কপালে অনেক স্পেশাল দুঃখু, শুধু কি মেয়ে? ভাল-বাসা নামের 'হেরিটেজ' বাড়ির মেয়ে। শুধু কি নানা যুগের লেখক শিল্পীর জাফরানি গন্ধ? এমনকী নোবেল প্রাইজের আতরের খুশবুও লেগে আছে যে এ বাড়ির বাতাসে! আমার কি কম ঝামেলা ভাই? এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে, এই সব অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, আমি একটা আলাদা নির্ঝঞ্ঝাট লোক, একটা ফুরফুরে একলা নিজস্ব মেয়ে হতে চাইলেও তা আর সম্ভব নয়। এইসব ফালতু, উপরি ওজনের ফলে, যার জন্যে আমার নিজের কোনওই কৃতিত্ব নেই, কে বলতে পারে, এ বাড়ির নেহাত এলোমেলো ডায়েরিদেরও হয়তো বা 'ফ্যালনা' স্টেটাস জুটবে না! তাই তো আমি সতর্ক হব বলে মোটে ডায়রিই লিখি না আজকাল। কী জানি বাবা কবে কেমন মুড থাকবে, কার নামে কী লিখে বসব? একেই তো এই 'ভাল-বাসার বারান্দা'য় বসে বসে যা খুশি লিখি। ভাল-মন্দ যাহাই হউক, মনের সব কথা তো সকলের কর্ণগোচর হওয়ার জন্য নয়?

মৃত্যুর পরেও কি মানুষ বন্ধুবিচ্ছেদ চায়?

উত্তর : না। চায় না। তা হলে কি আর পরলোকে গিয়ে যুধিষ্ঠির কুরু-পাণ্ডবদের নরকে দেখে একা একা স্বর্গে যেতে অস্বীকার করতেন? নির্বান্ধব স্বর্গ তো নরকেরই আর এক চেহারা। এই গল্প এক প্রচণ্ড মানুষী পিছুটানের, ধর্ম কর্ম যে নামেই ডাকো তাকে। আমরা যেখানেই যাই একাকিত্ব কাটাতে নিজের লোক খুঁজি। মৃত্যুতেও বুঝি সেই খোঁজার সমাপ্তি নেই।

ডায়রিতে আমরা সেই একান্ত নিজস্ব, বিশ্বস্ত, অনন্য বন্ধুটিকেই সৃষ্টি করি, তার হাত ধরি, তার সঙ্গে নিভৃতে প্রাণের কথা বলি। সে বিজন বাতায়নে কি আর কারুর উঁকিঝুঁকি মানায়?


french class
কলেজ স্ট্রিট
mp3
semester
কলেজ ফেস্ট
nose stud
t-shirt
id card
চকোলেট
ইংলিশ নোটস
মোবাইল
denim
canvas shoe
girl talk
bangles
পোস্টার
চুইং গাম
পকেট মানি
বইমেলা
ঝুম্পা লাহিড়ী
mood swings
long drive
SMS-এ ঝগড়া
দিদির নালিশ
পারফ্যুম
সানগ্লাস
কফিশপ
facebook
পার্টি
multiplex ticket
ড্রাইভিং লাইসেন্স
বৃষ্টিতে ভেজা
ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো
ভালোবাসা
sidney sheldon
bunking
মাউথ ফ্রেশনার
রণবীর কাপুর
ipod

প্রথমে

ডায়রি লোকে কেন লেখে? কেউ লেখে নিজের ঘাড়ে মাথা রেখে কাঁদবার জন্য, কেউ লেখে পয়লা জানুয়ারি তাকে একজন এসে একটা ঢাউস ডায়রি উপহার দিয়ে গেছে বলে। কারও ডায়রি তার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয় আর সে নোবেল প্রাইজ পায় আর তার বউ তাকে ছেড়ে চলে যায়। সন্দেহ হয়, গোপনতম কথাগুলো লেখার সময়ে লোকটার হয়তো মাথায় ঘুরছিল ছাপার অক্ষরে এগুলো কী প্রকাণ্ড বিতর্ক তৈরি করবে তার হিসেব। একইসঙ্গে স্তম্ভিত হতে হয় তার আত্ম-উন্মোচনের স্পর্ধা দেখে। কারও কাছে ডায়রি স্বীকারোক্তির কুঠুরি, কারও কাছে লেখক হওয়ার খসড়া, কারও কাছে বহুদিন বাদে ফিরে এসে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা, কারও কাছে অন্যকে দেখিয়ে একটা ভিনকাজ করার অহং-জোগানদার, কারও কাছে নিজের সামান্য পুঁজি নিয়ে দার্শনিক সাজার ছদ্মবেশ। অধিকাংশ সময়ই লোকে ক'দিন ফ্যাশন করে, তারপর ডায়রি লেখা ছেড়ে দেয়, বোর হয়ে। বা, এই উপলব্ধি করে, জীবনে কিছুই বিরাট ঘটছে না। ঘটনাবিহীন জীবনের ক্লান্তিকর দৈনন্দিন বিবরণ আবার নতুন করে লেখার কী আছে? ডিটো দিয়ে দিলেই হয়। কেউ কেউ নিয়মিত ডায়রি লেখে বলে নিজের স্বামীকে মহা শাসায়। 'এরকম করলে তো? এই কথা বললে তো আমায়? আমি কিন্তু ডায়রি লিখি!' অর্থাৎ, আমার স্মৃতি থেকে একথা মুছে গেলেও, ডায়রি থেকে মুছবে না। কালির জোর ব্রেনের স্মরণ-কোষের চেয়ে বেশি। ফলে অনন্তের খাতায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোমার এই অপরাধ!

এতে কোনও সন্দেহ নেই, যে কোনও সৎ ডায়রি মূলত একাকিত্বের কথা বলে। কোনও মানুষই নিজের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যবহার নিয়ে মোটে সন্তুষ্ট নয়। দশ লক্ষ পুরস্কার যে পায়, সে-ও ক্রমাগত অভিযোগ করতে থাকে, পরের পুরস্কারটা কেন এখনও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। 'আমাকে কেউ বুঝল না' বা 'আংশিক বুঝল', এ নালিশ প্রত্যেকের। ডায়রিকে সে বলে, দ্যাখো না ভাই, আমি এই এই করলাম, আর ওরা কিনা এখনও আমায় মাথায় তুলে নাচলে না! পদার্থবিদ লিও জিলার্ড একবার তাঁর বন্ধু হ্যান্স বেথ-কে বললেন, 'ভাবছি একটা ডায়রি রাখব। সেটা পাবলিশ করব এমন কোনও ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু ঘটনাগুলো লিখে রাখব, যাতে ভগবানের সুবিধে হয়।' বিচার করার সুবিধের কথা বলছিলেন নির্ঘাত। হ্যান্স জিগ্যেস করলেন, 'তা, তোমার কি মনে হয় ভগবান ঘটনাগুলো জানেন না?' জিলার্ড বললেন, 'হ্যাঁ, তা জানেন। কিন্তু ঠিক ব্যাখ্যাগুলো তো জানেন না।' সক্কলেই নিজের সম্পর্কে, আর নিজেকে জড়িয়ে ঘটে চলা ঘূর্ণিগুলো সম্পর্কে, ঠিক ব্যাখ্যা আর প্রকৃত বয়ান জানানোর কাঙাল। কেউ অবশ্য উচ্চৈঃস্বরে তা ট্রামে-বাসেও জানায়। মাতাল হয়ে রাতদুপুরে পথ হাঁটার সময়ে অনেকে ঘুমন্ত বাড়িগুলোকে জানায়। যাদের নেড়ি কুকুরের ভয় আছে, তারা অতটা পারে না। ডায়রি লেখে। প্রত্যেকের মনে একটা চক্রান্তকারীদের লিস্টি আছে। কারা শয়তানি করে তাকে উঠতে দিল না। সুখী হতে দিল না। রাষ্ট্র, মেজদা, ট্যারা কলিগ, বউ, ছায়া দেবী মার্কা শাশুড়ি, সব্বাই এই তালিকায় থাকে। এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার প্রেমিকাকে কেড়ে নিয়ে সটকায়। এখন যুগলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে দেঁতো হেসে জিগ্যেস করতে হয়, 'বাবলু কোন ক্লাসে উঠল? এইট-এ?' এই পুঁজ-রক্ত একজন কোথায় রাখবে? এই কানের গোড়ায় শনশন জ্বালা? বাথরুমে বা ঘুমঘোরে সে মেয়েটিকে এবং বন্ধুটিকে, বউকে এবং গামছা-পরা প্রতিবেশীকে, টিভি চ্যানেলকে এবং খোঁদলওলা রাজপথকে খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছে। সেসব তার নিজেরই কাছে কখনও বাতুলতা মনে হয়। কিন্তু ডায়রিতে, সেই লিখিত ক্রোধ, বিলাপ ও তিরস্কার কী করে যেন একটা বাড়তি মান্যতা পায়। বোধহয় লিখিত বলেই। তা কথার মতো বাতাসবাহিত হয়ে বাতাসেই উবে যায়নি।

অন্যের ডায়রি পড়ার মূল আকর্ষণ হল, চরম ব্যক্তিগত কেচ্ছা জানতে পারা। যা সে কাউকে জানাতে পারেনি, তা আমি জানব। নিশ্চয়ই এক্সট্রা-রগরগে কিছু হবে। এই প্রবণতায় আমরা ছোড়দির ডায়রিও চুরি করে পড়ি, আবার গাঁটের ডলার খরচা করে বিখ্যাত লোকের ডায়রিও কিনি। সে বই বাড়ি নিয়ে আসার সময় আমাদের গা-টা উত্তেজনায় ঝমঝম করে কেন? সে লোকটা ক'টা অবৈধ সম্পর্ক করেছে, যৌনজীবন সম্পর্কে কিছু লিখেছে কি না, বউকে কীভাবে খুন করতে চেয়েছে, আর সমসময়ের অন্যান্য বিখ্যাত মানুষকে কেমন আপনমনে যাচ্ছেতাই বলেছে, তা জানবার জন্যই তো? ডায়রি পড়ে হয়তো দেখি, ও বাবা, বিস্ফোরণ তো নেই এতটুকু! নিতান্তই ইসবগুল আর খাজনা-নথি! ধুত্তোর! তার মানে, ডায়রিতে উঁকি দিয়েই আমরা নাটক খুঁজি। এবং সম্ভব হলে, নিষিদ্ধ টাইপের নাটক। যা সমষ্টিতে, প্রকাশ্যে, ব্যান হবে, এবং সেইজন্যই ডায়রিতে, ব্যক্তিগত চিলেকোঠার মধ্যিখানে, জ্বলজ্বল করছে। নিজের ডায়রি লেখারও উদ্দেশ্যও, অনেকটা তা-ই। নিজের জীবনটাকে একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা। সামান্য অনুভূতিগুলোকে ফাঁপিয়ে বেশ গভীর ভাবনার রূপ দেওয়া। তথ্যকে টানতে টানতে সত্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বাগানো। সবচেয়ে বেশি করে : ছোটখাটো ঘটনাগুলোকে অনেকটা বাড়িয়েচাড়িয়ে দেখা, যাতে পরে ফিরে পড়ার সময় মনে হয়, সত্যিই তো, আমার জীবনেও কিন্তু নভেলের উপাদান কম ছিল না। এই করতে গিয়ে আমরা ডায়রির পাতায় অনেকটা সত্যি আর কিছুটা ইচ্ছে-আবির মিশিয়ে একটা হতেও-তো-পারত বাস্তব বানিয়ে নিই, যেমন অ্যালবামের ক্ষয়ে যাওয়া সাদা-কালোকে অনচ্ছ সাদাটে কাগজের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসিটি নিয়ে এইজন্যই বলেছিলেন, 'আমি বেড়াবার সময় আমার ডায়রিটা সঙ্গে রাখি। ট্রেনে একটা রোমহর্ষক কিছু পড়তে হবে তো!'

ডায়রির সবচেয়ে বড় গুণ : হাতের লেখা প্র্যাকটিস হয়, আর, 'এতগুলো বছর যে বেঁচে ছিলাম, কী করছিলাম?' এই অবধারিত কূট প্রশ্নের একটা উত্তর মেলে। অন্তত পরিসংখ্যানগত উত্তর। যে,



সাতাশে তুমি ঘুমোচ্ছিলে, আটাশে গিয়েছিলে আড্ডা মারতে, উনত্রিশে ঘুমোচ্ছিলে, তিরিশে ঘুমোচ্ছিলে, আবার একত্রিশে গিয়েছিলে আড্ডা মারতে। পরীক্ষার আগে যেমন মনে হয়, হায় হায়, অ্যাদ্দিন আমি পড়িনি কেন, জীবনেও তো একটা সময় আসে, যখন বোঝা যায় শ্রম ও অধ্যবসায় আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারত, আর আর আমি নিজেকে কোন দ-য় এনে ফেলেছি। সেই হল ডায়রি পড়ার সময়। কপালে করাঘাত করে বোঝার সময়, জীবন ঠিক এইরকমই জঘন্য ছিল, বছর দশ, পনেরো, বিশ আগেও আমি ছিলাম অবিকল এমনই অলস, ফাঁকিবাজ ও দিবাস্বপ্নবয়নকারী, আর চলতি ধারণা অনুযায়ী নিজেকে যে জপিয়ে নিয়েছি অতীত ছিল অপূর্ব দুরন্ত এবং সকল ইথার সবে ইদানীং গেঁজে গেছে, তা ভুল। ডায়রি এদিক থেকে নিষ্ঠুর আয়না বটে। আর, যাদের জীবনে কাব্যিক প্রেম সত্যিই আসে আর তেমনই ধূমকেতুর মতো চলে যায়, যারা পারে এমন একটা কবিতাশৈলীর কথা ভেবে ভেবে বের করতে যা ভেঙে ফেলবে পাঁচিল, যারা টাকা বা যৌনতা বা খ্যাতির জন্য চড়ে পড়তে পারে বাজপাখির পিঠে, তাদের ড্রিব্‌ল-এর আসল ময়দান ডায়রি-ই। আমরা ঢোক গিলতেও ভুলে যাই, যখন তাদের ব্যক্তিগত তরোয়াল ঝিলিক মেরে আমাদের বলে যায়, এমনও জীবন হয়। সে ডায়রি এক অমূল্য মায়াদর্পণ। পরের রোববার লফ্‌ট পরিষ্কার করতে বসে নিজের ডায়রি বেরিয়ে পড়ে। সেদিন চান করারও বেলা বয়ে যায়। মাংসও তেমন সুস্বাদু ঠেকে না।

অনেকের মতেই অবশ্য, ডায়রি নিয়ে এত আদিখ্যেতার কিচ্ছু মানে নেই। জীবনটা বাঁচার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘ্যানঘ্যান করে তার খুঁটিনাটি লেখার জন্য নয়। আর, সত্যিকারের যে বেঁচে নিচ্ছে এই প্রবল ঢেউয়ে হাবুডুবু খেয়ে ও ঝাঁপসাঁতার দিয়ে, তার কখন অত সময়, বর্ণমালার শরণাপন্ন হয়ে তা কুটুরকুটুর করে লিখে রাখার? যে মানুষ পার্টিতে উদ্দাম নাচে ও সতেরোটা চুমু খায়, তারপর হুডখোলা গাড়ি চড়ে চিল্লিয়ে গান গাইতে গাইতে যায় রাত্তিরের শহর বেয়ে, তার কি ডাইরি লেখার ন্যাকামিকে ঠাঁই দেওয়া সাজে? ওই যে লোকেরা, যারা অপমানিত হয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না আর তার পরিত্রাণ খোঁজে ডায়রিতে কাঁদুনি গেয়ে, যারা জীবনে উঠে দাঁড়াতে পারল না বলে টেবিল-ল্যাম্পের বৃত্তে সেকথা লিখতে বসে পড়ল, যারা ঘটনা ঘটার সময় তার আনন্দ-দুঃখ-আবেগ না পুইয়ে ভাবতে লাগল এটা তার ডাইরিতে কেমন করে গুছিয়ে লিখবে আজ রাত্তিরে, বাক্যে কোথায় কোন ফোঁড় দেবে, আর আন্ডারলাইন করবে কোন কালিতে, তারা কি মানুষ? জ্যাকেলিন কেনেডি এই গোছেরই একটা ধারণা ছুড়ে দিয়েছিলেন ডায়রি-লেখকদের দিকে। এক ধরনের অসহায় অতীতবিলাসী বলে ডায়রি-বাজদের অভিহিত করেছেন অনেকেই। কিছুর মধ্যে কিছু না, জীবনটাকে টুকতে বসল, তারপর বছর বছর পেরিয়ে, জমিয়ে বসল ফ্ল্যাশব্যাক-এর আঁচ নিতে। এনখ পাওয়েল বলেছেন, 'রোজ ডায়রি লেখা মানে নিজের বমির কাছে ফিরে ফিরে যাওয়া।' বাস্তব উগরে ফেলে দিয়েছে যে সময়টুকুকে, তা ঘাঁটাঘাঁটি। এক ধরনের কাপুরুষতা, সত্যিটাকে মুচড়ে না-ধরতে পেরে ছায়াটার সঙ্গে যুদ্ধ ও মিতালির মহড়া। অবান্তর, আত্মপ্রশ্রয় দেওয়া একটি ব্যায়াম।

কিন্তু বয়স বা পেল্লায় জীবন-প্রহার এসে যার কাছ থেকে নিয়ে গেছে সব স্বর্ণপ্রহর, বা জীবন যার কাছ থেকে নিয়ে যায় অন্যায় দাদন নিরন্তর, তার কি সত্যিই ডায়রি নয় একমাত্র সাক্ষী, আর কিছুর না-হোক, অন্য অস্তিত্বের? তার কাছে কি ডায়রি নয় সাবেক বাড়ির শয্যাঘরের ফুলতোলা আয়না? ডায়রি নয় নিজের নরম কোল? তা ছাড়া, নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার চেয়ে নিখাদ তো আর কিচ্ছুই নেই, থাকতে পারে না। বাকি সবই তো নাগাড়ে গুলিয়ে দেওয়া ও গুলিয়ে ফেলার প্যাঁচ-পয়জার। সেই কথন বুনে বুনে যাওয়ার মধ্যে তীব্র সত্যি রয়েছে এতখানি, শুধু তার জোরেই ডায়রি মূল্যবান তাকিয়ে থাকে, পিছন থেকে প্রেমিকার চাউনির মতো। সবচেয়ে প্রিয় আমি-র কাছে ফিরে আসার, দু'দণ্ড বসার যে নুড়িপথটুকু মানুষ মাঝে মাঝে সযত্নে তৈরি করে রাখে, পুঁতে রাখে ইতিউতি দু-একটা চারা, তার মান তাই অন্যখানে। নিজের সবচেয়ে নরম, গোপন বালিশের কাছে। মে ওয়েস্ট-এর কথা একটু বেঁকিয়ে বলাই যায়, 'ডায়রি রাখো, ডায়রি রাখো, একদিন ডায়রি-ই তোমাকে রাখবে।'

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বা র ম লা ট ▲ মউলি মিশ্র

এক শালিক দুই শালিক

নিজের গোপন মেঘ-বৃষ্টি-রোদ লিখে রাখার জন্য ডায়রি। আর তার আকুল দিন গোনা, কবে কেউ লুকিয়ে-চুরিয়ে বা ছিনিয়ে নিয়ে পড়বে এই হিরেকুচি, আর চমকে যাবে, মুগ্ধ হবে লেখক/লেখিকাটির কথা ভেবে। অনেকক্ষণ ধরে ভাববে। তারপর কাছে এসে বলবে, আমাকে নাও।

নাঃ, একথা কখনও কোনওদিনও ভাবিনি যে আমার ডায়রি নিয়ে প্রথম লেখাটা আমাকেই লিখতে হবে!

প্রথম—এই জন্যে, এখনও আশা আছে, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও—এর পরের লেখাগুলো অন্যেরা লিখবে—একসঙ্গে ন-দশটা ডায়রি জড়ো করে, রীতিমতো রিসার্চ করে, তবেই।

কেউ কোনওদিন পড়বে—এই গহন ইচ্ছে নিয়েই ডায়রি লেখার শুরু, কেউ কোনওদিন পড়বে না, জানতে পারবে না আমার কথা—এমন গোপনীয়তার বাসনা নিয়ে কস্মিনকালেও নয়।

আমার তখন পাঁচ বছর। জীবন জুড়ে প্রবল দুঃখ। দুঃখের কারণও অসংখ্য। এক তো গরমকালে মাথায় ফোঁড়া হয় বলে প্রতি গ্রীষ্মে ন্যাড়া হতে হয়, চুল কখনও কদমছাঁট পেরোয় না...রোগা টিংটিঙে চেহারায় কোনও জামা ঠিকমতো আঁটে না, মা দাঁতে দাঁত পিষে যত্রতত্র সেফটিপিন আটকায়। মাথায় বোরিক পাউডার লাগিয়ে কিম্ভূত চেহারার সেই বালিকার গোল্লাছুট হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই—খেলতে গেলেই বন্ধুরা সরে সরে যায়...ইস্কুল যাওয়া বন্ধ, কারণ ক্লাসরুমে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে গেলেই, দিদিমণি ক্লাসে ঢুকলেই কী এক অজানা আশঙ্কায় ইজের ভিজে যায়। পেছনে হাত দিয়ে পটি চাপতে চাপতে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে বালিকা—বাবা তখনও তাকে স্কুল থেকে নিতে আসেনি...এইভাবে হয় না কি? রোজ রোজ? স্কুলে গেলেই হয় জ্বর, নাহয় প্যান্টে পটি... তাই ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। খেলতে বেরনোর ইচ্ছে মরে গেছে। দিনরাত দেড়ঘরের টিনের চালঅলা বাড়ির উঠোনে খুঁজে বেড়ায়, কখন এসে বসবে জোড়া শালিক। তাদের দুঃখভরা উঠোনে সেই জোড়াকে দেখে কপাল আর বুক ছুঁয়ে 'নমো নমো' করবে মেয়ে, 'আজকের দিনটা যেন ভালয় ভালয় কেটে যায়, দেখে দিয়ো ঠাকুর...'। চোখ বন্ধ করে এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই চোখ খুলে দেখে কখন ফুট করে উড়ে গিয়েছে একজন—আর শীর্ণ ঘাড় নাড়িয়ে এদিক-ওদিক বোকা বোকা চাইছে সেই একটি শালিক—তারই মতো। যাঃ! আজ রাতেও তার মানে মা-বাবার ঝগড়া।

এবং রাত ঘনালে ঝগড়া ঘনায়। প্রথমে চাপা গলায়, কারণ ওই দু'টো মানুষ জানে, সে সদ্য ঘুমে। চেঁচালে জেগে যেতে পারে! কিন্তু সে তো আগাগোড়াই জেগে। ঝগড়া-ঝাটাপটি-দেওয়ালে মায়ের মাথা ঠোকা, দারিদ্রের হাজার একটা কারণ নিয়ে চাপান-উতোর, অযৌক্তিক আলোচনার পর মা দুম্দাড় খাট থেকে নেমে যায়, প্যাকিং বাক্সের খাটে প্রবল ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ওঠে...মা বুঝি মরে যাওয়ার ভয় দেখায়...বাথরুমে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দেয়। আর সে 'দ' হয়ে শুয়ে থাকে নিঃসাড়ে। তলপেটে হিসির ধাক্কা সামলে, গলার কাছে উপচে আসা কাশি সামলে শুয়ে থাকে—কোনওভাবে জানানো যাবে না, সে জেগে আছে, সে জানতে পারছে, বুঝতে পারছে সব।

একসময়ে, ভোরের দিকে শান্ত হয়ে আসে সব। দু'টি মানুষ লড়তে লড়তে, পরস্পরকে অভিযোগ, আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অসহায়ের মতো খুঁজে নেয় পরস্পরের শরীরের আশ্রয়। প্যাকিং বাক্সের খাটে ফের ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ ওঠে। ওদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আশ্লেষ আর অগাধ শান্তি তখন...

মেয়েটি নিঃশব্দে হিসি করে দেয় বিছানায়। গলার মধ্যে বিছানার চাদর ঢুকিয়ে খুকখুক কেশেও নেয়।

দু'টি মানুষ কিছু টের পায় না। একটা শালিক মিটিমিটি হাসে।

২

'আজ সকাল থেকে 'ম', 'ব'-এর সঙ্গে কথা বলছে না। আর আমি সকালবেলাতেই এক শালিকও দেখেছি। খুব ভয় করছে। আমার মাঝে মাঝে 'ম'-এর জন্য খুব কষ্ট হয়। অবশ্য 'ম' আমাকে বেশি মারে। কিন্তু 'ব' 'ম'-কে বেশি কষ্ট দেয়। আমি ওদের দুজনকেই খুব ভালবাসি। কিন্তু আমার খুব ভয় করছে। তাছাড়া তুতুনরা বলেছে আমার 'ম' কে খুব সুনদর দেখতে। আমাকে দেশ থেকে আনা কাজের লোকেদের মতো দেখতে। বুলা যেমন থাকে আমাদের বাড়িতে। তাছাড়া রূপকদা-কে দেখলে আমার খুব মন কেমন করে। আমি সারাদিন শুধু লিখব আর একদিন নোবেল প্রাইজ পাব। তখন সবাই বুঝবে।'

ডায়রির একটা পাতা এইরকম। 'ম' মানে যে মা আর 'ব' মানে যে বাবা—তা যেন কেউ কোনওদিন বুঝবে না। আসলে তো বুঝবে বলেই লেখা। কী হবে বুঝে—সে অন্য কথা। কিন্তু আজ নয়, কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে, যখন আমি বড় হয়ে যাব, আমার সঙ্গে আমার 'ম' আর 'ব'-এর বন্ধুর মতো ভাব হয়ে যাবে—সেদিন আমার গোপন বাক্স থেকে বের করব সবক'টা ডায়রি—আর তিনজনে মিলে একসঙ্গে বসে পড়ব সব লেখা। ওরা বুঝতে পারবে আমার দুঃখের কথা। আমার এইভাবে ডায়রিকে আশ্রয় করা তো ওই জন্যেই!

কিন্তু যখন ডানা গজাল? মাথাভর্তি চুল, নারী হিসেবে প্রথম রক্তের স্বীকৃতি আর শরীর যেন জলে জলে থইথই কংসাবতী—সেদিনও কি চাইতাম, আমার ডায়রি পড়ে নিক ওই দু'জন মানুষ? চাইতাম না হয়তো। তাই ডায়রির ভাষা ক্রমশ আরও সাঙ্কেতিক হয়ে উঠছিল, নৈর্ব্যক্তিক। অনুভবের সব কথাই থাকছে, কিন্তু ঠিক কাকে নিয়ে লেখা সেটা কেউ বুঝবে না।

ডায়রি লেখার প্রথম প্রেরণা কখনও এমন ছিল না যে, নতুন বছর পড়ল বলেই, হাজার একটা ডায়রি বাড়িতে জমা হল বলেই কোনও একটার পাতা খুলে ১ জানুয়ারির দিনে সেদিনের দিনলিপি, পরের তারিখে পরের দিনেরটা—এসব লিখে ফেলতে হবে। না, দিনলিপি লেখার কোনও ইচ্ছে কোনওদিন ছিল না। সেই কোন শৈশবে, কেউ বলেনি, তবু জেনে গিয়েছিলাম—আমার এমন কিছু রোমাঞ্চকর জীবন নয় যে, সেখানে প্রতিদিন শিহরন জাগানো কিছু ঘটবে। কুট্টি কুট্টি, ন্যাড়া মাথার ওই মেয়েবেলা বুঝিয়ে দিয়েছিল—আমি যা ভাবছি, সেটাই আমার লেখা। এই মফস্বল শহরে একটা মেয়ে তার নিজস্ব অনুভূতি নিয়ে বড় হয়ে উঠছে—সেটাই তার ডায়রির উপপাদ্য। নতুন বছরের ইংরেজি ক্যালেন্ডার নয় সেটা।

এবং কষ্ট। নিজের কষ্ট জানানোর সবথেকে ভাল উপায়



ডায়রি। আর তখন তো কষ্ট মানেই কোনও একজন—দু'জন—তিনজন মানুষকে নিয়ে প্রত্যাশা আর তার চুরমুর করে ভেঙে পড়া। ডায়রি লেখা মানেই সেইসব মানুষ আমার অজান্তে গোপনে পড়ে ফেলে বুঝে নেবে সব কথা—সিনেমায় যেমন হয়।

তেমন কিছুই হচ্ছিল না। তাই ডায়রিকে হটিয়ে এসে গেল চিঠি।

তো, কাকে লিখব চিঠি? এই যে স্তরে স্তরে জমা হচ্ছে হাজার একটা দুঃখ, প্রত্যাশা, কোটেশন—কাকে জানিয়ে জাহির করব সেটা?

৩

আমাদের তো মেয়ে-ইস্কুল। এবং যখন সেভেন-এইট-নাইন—তখন মা-বাবার ঝগড়া এবং মিলন সেভাবে দুঃখ তৈরি করে না। বুক ভেঙে যায় মোনালিসা মাইতি আর ঝিল্লি মান্নার বন্ধুত্ব দেখে। আমি যেন ওদের মাঝখানে বাড়তি কেউ। তা হলে কি রেজাল্ট ভাল হলে বন্ধুরা আর ভালবাসে না? কিন্তু আমি তো লিখতে আর পড়তে ছাড়া কিছুই পারি না সেভাবে! সেই ছোটবেলায় বাবা যখন অফিস বেরোত—কান্না-কান্না গলায় বলতাম—'আমার জন্য একটা বন্ধু এনো বাবাই।' কোনওদিন আনেনি। কারণ, বন্ধু তো বাজারে অমিল। আর আজ এই মেয়ে ইস্কুলে লেখাপড়ায় সাধারণ, সব দিকেই—তাকে যে মনপ্রাণ ঢেলে ভালবাসলাম—তার কোনও রিটার্ন নেই?

প্রাণ উছলে উঠছে ভালবাসায়। মানে, 'ভালবাসা' নামক কোনও অপার্থিব অনুভূতিতে। সেখানে পাত্র গৌণ। অনুভবটাই আসল। আর ওই ছোট থেকে তৈরি হয়ে থাকা নীতিবোধ—মাথামুণ্ডু-বিহীন। তবে কিনা, কোনও বিপরীত লিঙ্গকে দেখেই তো মনে হচ্ছে না, তার কাছে ভালবাসার এই ভরা মেঘের বৃষ্টিপাত ঘটানো যেতে পারে।

মোনালিসাকে আবেগমথিত ভাষায় বেশ কয়েকটা চিঠি লিখলাম। নিজের যাবতীয় অনুভূতি উজাড় করে। এই মোনালিসার সামনেই একদিন ড্রেস চেঞ্জ করছিলাম—অষ্টমীর দিন—প্যান্টি আর ব্রা শুধু—ও বলেছিল—ওঃ, ফাটাফাটি ফিগার তোর! সেই স্মৃতি বুকে চেপে কত কত মর্মস্পর্শী চিঠি লেখার চেষ্টা করছি ...ও পাত্তাই দিল না। উল্টে ঝিল্লিকে লেখা ওর 'প্রেমপত্র' পড়ে তিনরাত ঘুম নেই আমার। কী লাভ এই জীবন রেখে। কিন্তু ডায়রিকে জানালাম না সে কথা। আমার নিভৃত কথন কোনওদিন বুঝবে মোনালিসা? পড়তেই কি পারবে কখনও? ওর সেই ধৈর্য আছে? প্রেমের উত্তাল ঢেউ আছাড় খাচ্ছে বুকে কিন্তু আধার পাচ্ছে না কোনও। কুচো বয়সের ভালবাসার বালকেরা আজ কিশোর হয়েছে বটে, গোঁফের রেখা আর চোরা চাউনিতে মায়াডাক দিচ্ছে বটে, কিন্তু মন ছুঁচ্ছে না সেই ডাক। আমি সেভেন আর মৃন্ময়দা মাধ্যমিক দিল। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন। নামেই সম্ভ্রম জাগে, মানে, ওর ইস্কুলের নামে। তা হলে? ভালবাসা একটা পাত্র পেল যেন। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে ওর অনায়াস যাতায়াত—সাইকেলে, আর আমি মুখিয়ে থাকছি, কখন একবার যাবে ও...মাধ্যমিকে ৭৪৬। আমাদের পাড়া খুব নম্বর-কনশাস। তারা এখন মৃন্ময়দা-কে 'হিরো' ভাবে। কিন্তু আমি মোনালিসাকে চিঠি লিখতে পারি, ওকে নিয়ে গপ্পো লিখতে পারি—কিন্তু মৃন্ময়দাকে চিঠি লেখা তো নিষিদ্ধ। আমার 'মা' তা-ই শিখিয়েছে আশৈশব। হতে পারে আমার চুল এখন পিঠ ছুঁয়েছে, তাতে সিঁড়ি-কাট। ধাপে ধাপে বেশ একটা কায়দা হয়েছে, হতে পারে এখন আমি আমার চেরি-রঙা হারকিউলিস ক্যাপ্টেনে রাস্তা পেরোলে লোকজন হাঁ হয়ে যায়...ন্যাড়া মাথা শৈশবের দুঃখ আজ আর নেই। মা-বাবার ঝগড়া অন্য ঘরে হয়। আমাকে স্পর্শই করে না। তবু...তবু...এবং তবু...দুঃখ আমার পিছু ছাড়ছে কই! তাই আবার ফিরে আসা ডায়রির কাছে। চিঠির কাছেও। কীভাবে?

৪

মধুমিতা। শ্যামলা। ভীষণ মিষ্টি। ছোট্টখাট্টো। আর দারুণ ব্রিলিয়ান্ট। ওরা খুব বড়লোক। তো, কী! মধুমিতাও লেখাপড়ায় খুব খুব ভাল। ক্লাসে কখনও ও ফার্স্ট, কখনও আমি। ওর একটা পড়াশোনার আলাদা ঘর আছে। তা হলে ওই ঘরেই বসে ও ডায়েরি লিখতে ও পড়তে পারে...এরপর কোন এক অলীক বোঝাপড়ায় আমার ওকে লেখা চিঠি আর ডায়রি মিলেমিশে গেল...কী ভাবে? সে এক দারুণ রহস্য।

আমার সংগ্রহে ছিল কারও দেওয়া চারবছর আগেকার একটা পুরনো ডায়রি। আমি সেখানে চিঠি লিখতে শুরু করলাম। একদিন চিঠি লিখে পরের দিন ডায়রি ফেরত দিয়ে দিতাম ওকে। ও তার উত্তর লিখল। ফিরিয়ে দিল আমাকে। 'আমি আজ স্কুলে যেতে পারলাম না রে। পিরিয়ডের খুব ব্যথা। আর সকাল থেকে কেমন একটা ঝিম ধরা ভাব। তোকে সারাদিন খুব মিস করলাম। তোর পাশে আজ কে বসেছিল? পারমিতা? লক্ষ্মীসোনা, ওকে আমার জায়গাটুকু সত্যি সত্যি দিয়ে দিস না। তুই ছাড়া আমার আর এই দুনিয়ায় কেউ নেই। আমার সমস্ত কিছু তোর। একটা দিনও স্কুল কামাই করতে ইচ্ছে করে না—শুধু তোর জন্য। আচ্ছা মউ, আমি যদি কারও প্রেমে পড়ি? মানে তোর প্রেমে তো ডুবেই আছি। যদি কোনও ছেলে আসে আমার জীবনে? তুই তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবি? ...মিথ্যে বলিস না, তুই পারবি না। ও হ্যাঁ, তোকে জানাই, আমার কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল খাতাটা পূর্বার কাছে থেকে গিয়েছে। কাল আনবে। যদি আমি যেতে না পারি—প্লিজ প্লিজ তুই নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিস। আজ এই অবধি। তুই কিন্তু উত্তর দিতে দু'দিনের বেশি দেরি করিস না...প্রমিস?'

ডায়রি কাম চিঠি ও-বাড়িতে যায় একবার, এ-বাড়িতেও ফেরে। এই সেই সঠিক কম্বিনেশন—চিঠি প্লাস ডায়রি। যাকে লিখছি, ডায়রিই লিখছি, কিন্তু ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে তারই কাছে। এত মোটকা একটা ডায়রি—ভর্তি হয়ে গেল আমাদের দুজনের চিঠি আর চিঠির উত্তরে...আর কোনও সংশয় নেই, আমার যাবতীয় কথা যাকে নিয়ে, নিজের গোপন আর নিজস্ব কথাগুলো তারই কাছে পৌঁছে দিতে পারছি। ভালবাসা যেন আধার পাচ্ছে কোনও...সত্যি পাচ্ছে কি?

কে জানে কী ঘটছে। তখনও যে উঠোনে একটাই শালিক!

৫

'... লিখতে গেলেই এইসব,
লিখতে গেলেই পথচলার বৃত্তান্ত,
সংশয়থেকে নিশ্চয়তার দিকে ধীর সান্দ্র পদক্ষেপ
লিখতে গেলেই আর কিছু নেই
আধফুট বাই আধফুট কাগজের শরীর শুধু ...'

১৬ জানুয়ারির পাতায় লেখা—আসল তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪। এর আগেও অনেকটা আছে, পরেও অনেকটা। এই চিঠিটা সবুজ কালিতে লেখা। আর আমার উত্তরটা কালো কালিতে। ডায়রি এবং চিঠির এই সহাবস্থান যে কী প্রচণ্ড রোমাঞ্চকর—শিখেছিলাম মধুমিতার কাছ থেকে। বারো ক্লাসেই ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কিন্তু মনের মধ্যে রয়ে গেল কথোপকথনের এই অলীক বীজ। একদিকে দিনলিপির ধাঁচে ডায়রি—আমার দৈনন্দিনের খুঁটিনাটির বর্ণনা জানানোর লোক পেয়ে গিয়েছি ততদিনে...

হোস্টেলে থাকি। যেদিন ডায়রি আমার কাছে—রাতভোর চিঠি লেখা। তখনও বুঝিনি, নিজেকে পূর্ণভাবে জানান দেওয়ার এই চেষ্টা আদতে কোনও কিছুই প্রকাশ করে না। কেউই শেষ পর্যন্ত কাউকে জেনে উঠতে পারে না।

কিন্তু সে তখন কে বোঝে! ভাগ্যিস বুঝিনি। তা হলে দুঃখভরা



আর কান্নায় ভেজা ওই দুরন্ত সুখের সময়টা নির্জন গ্রীষ্মের দুপুরের মতো বিকেলে ঢলে পড়ত। উফ, কী দুঃখ কী দুঃখ! কথায় কথায় কান্না পাচ্ছে, একটুতেই অভিমান, মনে হচ্ছে খুব কঠিন অসুখ হয় না কেন, যাতে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে, ডায়রি ফেরত দেবে ও, আমার অসুস্থ, রোগজীর্ণ হাত একটুর জন্য ছুঁয়ে যাবে ওর সরু-লম্বাটে আঙুল। একসঙ্গে ছ'সাত পৃষ্ঠা চিঠি পাব সেবার। কী ভাবে ওর ক্লাসে মন বসেনি, ইউনিয়নের চেন ফ্ল্যাগ বানাতে গিয়ে ছড়িয়ে লাট করেছে...অনিদি ওকে গান গাইতে বলল—গাইতে গিয়ে গলা বুজে এসেছে চাপা কান্নায়...

এসব কিছু ঘটত না এমন নয়। কিছু কিছু ঘটত। হয়তো যেভাবে ভাবতাম, সেভাবে নয়। কিন্তু একটাই ডায়রির দুই মলাটের মধ্যে থেকে গেল স্বপ্নের মতো সেই ক'দিনের অনুভব। ডায়রির পাঠক নিয়ে আর কোনও দুর্ভাবনা নেই তখন। নির্দিষ্ট একজন পাঠককে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে গুটি গুটি স্বপ্নবোনা। হোস্টেলের উঠোনে এখন রোজ জোড়া শালিক।

'রক্ত কিংশুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিস
আমার দুই চোখে শীতের বন
ভীষণ অসময়ে বাতাসে বৈশাখী
ভীষণ অসময়ে শুভক্ষণ!

—নবনীতা দেবসেন

মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের এই যৌথ লেখালেখি যদি না থাকত, তাহলে আজ এই তিনমাসেই যেমন মনে হচ্ছে, অনন্তকালের পথ চলার অভিজ্ঞতা হাত ধরে আছে আমাদের, মাত্র এই কদিনেই আমরা যেভাবে উপলব্ধি করলাম যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে, ভাল থাকার জন্যে একে-অপরকে কী ভীষণ প্রয়োজন...আজ রাতে মনে হচ্ছে, এইভাবে আর কেউ কোনওদিন ভালবাসেনি, পৃথিবীতে আমরাই প্রথম পুরুষ এবং নারী যারা স্বপ্ন ভাগ করে নিতে শিখেছি, যারা ভাগ করে নিতে শিখেছি বেঁচে থাকা, সঞ্চিত ফসল...তুই কি এখনও জেগে আছিস? ঘুমিয়ে পড়। সব অনিদ্রা বরং আমরা পরের দিনগুলোর জন্য তুলে রাখি...

জেগে থাকা তোর দুই চোখে
অসুখ আর স্বপ্ন নিয়ে আছি
চোখের কোণে হাত দিয়ে দেখ
অশ্রু হয়ে আছি...'

ডায়রি কখনও এমন সততার মুখোমুখি হয়নি। এই সততা যুক্তির নয়, সম্পূর্ণ অযুক্তির এবং আবেগের, ঝরঝরে এক পশলা বৃষ্টির মতো স্বস্তির, প্রবল অশান্তিময় অথচ অনন্ত শান্তিরও।

এই ডায়রি তারপর দেখল সম্পর্ক ঘিরে সংশয় কীভাবে পাক খাচ্ছে...একটু একটু করে এর মধ্যে ঢুকে পড়ছে মিথ্যের নোনাজল, অনিশ্চয়তার দোলনায় দু'টো মানুষ উথালপাথাল দোল খাচ্ছে।

'৯৮ সাল নাগাদ এই ডায়রির পাতাতেই সম্পর্ক শেষের ভাষ্যটি লেখা হল। অবশ্যই নীল কালিতে। তারপর সবুজ কালির উত্তরের প্রত্যাশায় ডায়রি থেকে গেল অন্য ঠিকানায় ...

৬

ভোরবেলা বারান্দার দরজা খুললেই একখানা মোটাসোটা শালিক ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। প্রতিদিন, প্রতিদিন। ইংরেজি বছর শুরু হলেই জমা হয় সুদৃশ্য ডায়রি, অসংখ্য। অধিকাংশই অব্যবহৃত থেকে যায়। আর কয়েকটা তুলে রাখা হয় কবিতা কিংবা গল্প কিংবা অফিসের লেখালেখির জন্য। আর কোনওদিন ডায়রিতে চিঠি লেখা হয় না।

আর আজই বুঝতে পারি—এক শালিকে দিন খারাপ যাওয়া কাকে বলে! আজ বুঝি দুঃখ নিছক কোনও কুয়াশা নয়, আজ আর জমাট দুঃখ আমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে পারে না—ডায়রি তো নয়ই।

ছোটবেলা থেকে আজ অবধি লেখা আমার অনেক-অনেক ডায়রি আছে। কিন্তু চিঠি-ডায়রির একটি রয়ে গেছে মধুমিতার কাছে। পরেরটি অবশ্য ফিরে এসেছে আমার কাছেই। সবুজ কালির মালিক তার সুখী দাম্পত্যের মাঝখানে এই কাঁটাটিকে ঠাঁই দেয়নি। ভালই হয়েছে। ওটা এখন আমার সম্পত্তি।

আমার ডায়রি লেখার বিষয়ে সব কথা যে আমিও জানাতে পারলাম, তা নয়। কিছুই বলা হল না।

শুধু এটুকু বলি, নতুন বছর এলে আজ আর ডায়রির জন্য অপেক্ষা করি না, কারও চিঠির জন্যও নয়...শুধু বারান্দায় এক শালিক দেখে এলে খাটের উপর জড়ো করি পুরনো সব ডায়রি।

দিন ভাল হয়ে যায়।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডা য় রি ▲ অমিতাভ চৌধুরী

স্বগত সংলাপ

ডায়রি কখনও স্রেফ জমা-খরচের ফর্দ। কখনও মগ্ন, নির্জন, ব্যক্তিগত গানই একটি ডায়রি। কখনও উপন্যাসের বুক ফুঁড়ে বেরয় দিনলিপির তাপ।

ওই যে চুনিবালার বার্ধক্য-ক্লিষ্ট ভাঙা গলায়, কীর্তনের সুরে গাওয়া গানটি, যে-গান সত্যজিৎ রায়কে অমর করেছে অথবা, এই উক্তিরই বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলা যায়, 'পথের পাঁচালী'-ই গ্রাম্য কীর্তনটিকে চিরকালের জন্য স্মরণীয় করে গিয়েছে। কোনটা খাঁটি তা ভাবার বিষয় হতে পারে। কিন্তু একটা কথা নিয়ে ভাবনার কোনও দরকারই হয় না। একবার শুনেই যে কোনও বাঙালি বলবে, এই গানটি কোনও দিনলিপি নয়। বরং বলা যায়, এ হল দিনান্তের গান।

তা হোক। সব দিনলিপিই তো দিনের নির্ঘণ্ট হয়ে বাঁচার অধিকার পায় না? অনেক দিনলিপি আছে আত্মকথা বুকে নিয়ে, সে থাকে নিভৃতে। এই আত্মকথা তাঁর অন্তরের—লেখিকাদের ক্ষেত্রেই কথাটা বেশি প্রযোজ্য—সন্তর্পণে বলা স্বগতোক্তি। সেই স্বকথন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের মনের সঙ্গে একান্তে বসে কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে কথা বলার ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের আগুনরাঙা উপন্যাস, 'ঘরে বাইরে'। আর একবার তার পাতাগুলো উল্টে দেখুন, কী অসাধারণ তাপে ভরা সে কাহিনি? যেন গ্রীষ্মের নিদাঘ বুকে নিয়ে সে গদ্য কাঁপছে খরতাপে, মরীচিকা যেমন কম্পমান হয় মরুভূমির বুকে।

ওই উপন্যাসের প্রায় সবটাই বলা হয়েছে আত্মকথার বিবৃতিতে। উপল-প্রস্তরে পরিকীর্ণ বেলাতটে সমুদ্রের তরঙ্গ যখন আছড়ে পড়ে ভাঙে, তারই মতো, সন্দীপ, বিমলা এবং নিখিলের গম্ভীর জীবনের একটি কৃষ্ণকায় প্রস্তরখণ্ডের ওপরে গল্পটি আছড়ে পড়ে ভাঙছে। বিমলার ছিল বুক ভর্তিচাপা খরতাপ, যেন কলম ফুঁড়ে, খাতার পাতায় উপচে, সেই তাপ বেরচ্ছে তো বেরচ্ছেই। তার শেষ নেই।

'ডায়রি'-র অনেক রূপ। তার সম্পূর্ণই বিরস একটি রূপ হল একদিকে জমা, অন্যপাশে খরচের তালিকা। এই জমাখরচের ফর্দ, শুনেছি ডাইনে জমার এবং বাঁয়ে খরচের তালিকা, এবম্বিধ 'ফরম্যাট', অর্থাৎ ছাঁচটি প্রথম আবিষ্কার এবং ব্যবহার করেন ইতালির বাণিজ্যকর্তারা। শিল্পকলা-রন্ধনবিদ্যা এবং বাণিজ্যেরও ইউরোপীয় রাজধানী একদা ছিল ফ্লোরেন্স নগরী। এটা ইতিহাসের দিক থেকে অস্বাভাবিক একেবারেই নয় যে, ফ্লোরেন্সের সওদাগরেরাই এই 'ডান-বাঁয়'-এর পদ্ধতিটি মাথায় ঢুকিয়েছিলেন, একেবারে শেষ পংক্তিতে যাতে এক নজরে দৃশ্যমান হয়, লাভ হল কি লোকসান হল। বলা বাহুল্য, ব্যাঙ্কিং-এর মূলমন্ত্রও তাই। টাকা খাটানো এবং খাটুনে টাকার সুদ গুণে নেওয়া। তাতে শেষ অবধি লাভ হল কি হল না। সেও ওঁদেরই উদ্ভাবিত জগৎমোহিনী, এক দশভুজা দেবী। এখন প্রতীচী এবং প্রাচ্যের ঘানিতে, সব ব্যবসায়েই তেল ঢালছেন এই দেবী।

আমাদের দেশেও এই ফর্দ লেখার পদ্ধতিটি ঢোকে ফারসি আইন-আদালতের হাত ধরে। আমার পিতামহী ছিলেন ধরাকে-সরা-জ্ঞান করা প্রমদাসুন্দরী চৌধুরানি। শেষোক্ত ওই শব্দবন্ধ 'চৌধুরানি' তাঁর নামের অন্ত্য প্রত্যয় হিসেবে ঘোষণা করার অধিকার তাঁকে কোনও নবাব-বাদশাহ দিয়েছিলেন কি না, আমি নিশ্চিত নই। যে ক্ষুদ্রবপু ছিল তাঁর শ্বশুরালয়ের জমিদারির আয়তন, তাতে মনে করার কোনওই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না যে, কোনও নবাব-বাদশাহের দৌলতে তিনি 'চৌধুরানি' হবেন।

কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির, ছড়ানো সুবিশাল নদী-চর জল-জঙ্গল নিয়ে পদ্মার দুই পারে যে জমিদারি, সে তো ছোটখাটো একটা রাজত্ব। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ যে 'প্রিন্স' পদবিটি নামের প্রারম্ভিক প্রত্যয় হিসেবে যুক্ত করেছিলেন, সেটা আমার পিতামহীর বিলাসিতার সঙ্গে মোটেই তুলনীয় নয়। নাকের ডগায় চশমা এনে যদি কেউ তন্নতন্ন করে গবেষকের অন্বেষায় তাঁর আয়ব্যয়ের ফর্দ খুঁটিয়ে দেখতে যত্নবান হন, তা হলে সেই নীরস জমাখরচের ডাইনে-বাঁয়ে থাকে-থাকে সাজানো ফর্দের অবগুণ্ঠন ভেদ করে কী মণিরত্ন যে বেরতে পারে, তা ১৪ খণ্ড 'রবিজীবনী' দিয়ে প্রয়াত প্রশান্তকুমার পাল সব বাঙালির অন্তরে এবং ইতিহাসে ভালভাবেই গেঁথে দিয়েছেন।

ডায়রির অন্য একটি রূপ, আর কয়েকদিনের মধ্যেই কাজের টেবিলে উপস্থিত হতে থাকবে। কোনওটা সুদৃশ্য চামড়ার বাঁধাই, কোনওটা সিল্ক, কোনওটা হয়তো নিতান্তই গরিব কোম্পানির উপহার—সাধারণ সুতির মোড়কে বাঁধাই। তার আকারের বৈশিষ্ট্যও বিবিধ। পকেটে রাখার উপযোগী যেগুলো, তাদের চাহিদা প্রবল হলে কী হবে, দশ-বাই-চার সাইজের কাগজ দিয়ে খাতার আকার নিয়ে যারা ভূমিষ্ঠ হয়, তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। পকেট-ডায়রিরও আবার একটা খুদে সংস্করণ বেরয় কলকাতায়, যেটা পকেটঘড়ির পকেটে ঢুকতে পারে। শীলের প্রকাশিত ওইরকম একটি ডায়রি নিয়ে আমার বন্ধু, ক্যালিফোর্নিয়ার এক অধ্যাপক সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

উপহার হিসেবে এই ডায়রি বস্তুটি হস্তগত না হলে, আমাদের সামাজিক মর্যাদা যে কত নিম্নমুখী হয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এই ধরুন, বর্তমান সালের ডিসেম্বর আসতে না আসতেই আমি ভাবছিলাম যে, কই মর্যাদার এই চিহ্নটি তো এখনও ঘরে এল না? কলকাতায় বসে আছি, একটা ডায়রিও ঘরে ঢুকছে না, এই লজ্জা ঢাকি কী করে? এই শহরেই আমি যখন একটি বিখ্যাত নিশাদিশা কাঁপানো দৈনিকের সম্পাদক ছিলাম, তখন নভেম্বর পেরতে না পেরতেই টেবিল আচ্ছন্ন হত সুদৃশ্য ছোট-বড়—খাতার সাইজ, বইয়ের সাইজ, পকেটের সাইজে ভরা—ডায়রির স্তূপে। এবং সেই সময় অর্থীপ্রার্থীরা ভিড় করতেন, 'স্যর আমার জন্য কিন্তু একটা রাখবেন' এই বাহানা নিয়ে। ওদের শুধু নয়, ডায়রিগুলোর না আসা দেখেই মর্মে মর্মে বুঝি যে, 'ফ্রিল্যান্স' কলাম লেখকের বাজার দর কতখানি। ডায়রি উপহার পাওয়াটা একটা সামাজিক পারদ। ওই তাপ দেখে বুঝি বাঙালি সমাজে এখন কোথায় আমার স্থান।

এইসব চিন্তায় সমাজ-বৈরাগ্য যখন চরমে, তখন কী বলব, গতকাল সন্ধ্যায় সহসা সেই মধ্যকেতার, নকল রেক্সিনে বাঁধাই, বিখ্যাত সুর-এর ডায়রিটি এসে আমার বিষাদমগ্ন দশা খানিকটা লাঘব করেছে। এই 'সুরস ডিমাই ডায়রি'—অনেকেই দেখে থাকবেন—যে বাঙালি খুলে দেখেননি, শুধু তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই, সহজপাঠ্য, ক্ষুদ্র কলেবর, এই এনসাইক্লোপিডিয়া-টি বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে তাঁদের জন্য, যাঁরা ট্যাক্স দেন বা আদায় করেন। এবং যাঁরা একটা না একটা মামলা রুজু করার ফন্দি আঁটছেন। ওই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা বছরের পর বছর এই ডায়রির একটি সুদীর্ঘ সারণির দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন নিশ্চয়ই। নতুবা, প্রকাশক এত পৃষ্ঠা জুড়ে এই সারণিটিতে মামলা রুজু



করার প্রারম্ভিক মাশুল কত লাগবে তা লিপিবদ্ধ করতে যাবেন কেন?

ডিমাই-এর পরের বৃহত্তর ডায়রিটির আকার বাঁধাইয়ের লোকেরা বলেন 'ডবল ডিমাই'। আমরা সাংবাদিকেরা অন্য একটি নামে তাকে বেশি চিনি। আমরা বলি, চার-বাই-দশ সাইজ, ফোর বাই টেন—এই ধরুন, পুজোসংখ্যার পত্রিকাগুলোর যা দেহবহর হয় সেইরকম।

বছরের পর বছর একটি 'ইকনমিস্টের ডায়রি' কিনে টেবিলে রাখার মতো লোক বিশ্ব জুড়ে ছড়ানো, লাখ দুই লাখ তো হবেই। সে সব ডাইরি সুদর্শন, চামড়ায় মোড়া, মলাটের ওপরটা তুলতুলে, বাচ্চাদের গালে হাত দিয়ে যেমন লাগে। কিন্তু শিরদাঁড়াটি বেশ মোটা-মজবুত করে বাঁধানো হয় তাকে ব্রাহ্মণ্য দেওয়ার জন্য। সোনার জলে সত্ত্বাধিকারীর নাম লিখিয়ে নিতে গেলে অক্টোবর মাসের আগেই ফরমাস 'বুক' করতে হবে। সেই অগ্রিম ফরমাস বুক করে রাখাটা কতটা চাহিদার চাপের জন্য, কতটাই বা বস্তুটির আভিজাত্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে তৈরি একটা মার্কেটিং কৌশল, সে কে বলবে?

ওই 'ইকনমিস্ট' ডায়রির মতোই হংকং-এর ফরেন করেসপন্ডেন্ট ক্লাবের বার্ষিক ডায়রিগুলো তথ্যে ভরা, মলাটে, বাঁধাইয়ে প্রসাধনের রাজা। এক সময় ছিল যে, আমি ওই ক্লাবের নববর্ষের ডায়রিটি এনে আমার প্রিয়বন্ধুদের নববর্ষকে অভিনন্দিত করতে ভালবাসতাম।

বিলেতে, 'রানি ভিক্টোরিয়ার যুগ' বলে আখ্যাত সময়ের কয়েকটি জ্বলজ্বলে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, 'পাবলিক স্কুল'-এর বাড়বাড়ন্ত। আরেকটি বৈশিষ্ট্য, যা ঠিক আগেরটির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, তা হল : মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। এইগুলির জন্যই হয়তো, হঠাৎ যুবতীদের মধ্যে, সে বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা—একটা ডায়রি লেখার ঝোঁক জাগল। সে


Office Linc
January 2009
5
Monday
Week 02 · 5th Day
January '09



ঝোঁক এত দূর, তার জন্য নতুন আসবাব অবধি তৈরি হল। যেমন, ছোট ডেস্ক। এছাড়া, অন্যের নজর থেকে আড়াল করে রাখার জন্য একটা বিশেষ ধরনের বাঁধাই-করা খাতা। তাতে আবার চাবি দিয়ে রাখার ব্যবস্থাও আবির্ভূত হয়েছিল। এখনও সেই ধরনের ডায়রি বিলেতে অ্যান্টিকের দোকানে খুঁজে পাওয়া যায়। (এই রকমের একটা লুকনো ডায়রি হঠাৎ পাওয়া যাওয়াতে লেখিকার পূর্বেকার অজ্ঞাত জীবনকাহিনি এবং পরকীয়া প্রেমটি নিয়ে সাহিত্য দরিয়ায় বেশ কিছু হইচই ঘটেছিল, আমার মনে আছে। কিন্তু কার ডায়রি, সেটা মনে নেই। সেজন্য ওই গল্পটির বর্ণানায় বিরত থাকলাম।)

বিখ্যাত সাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর ডায়রি তো স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচির মধ্যেই পড়ে। সে ডায়রি তাঁকে বুঝবার জন্য। বিষাদসাগরে প্রায়ই কেন তাঁর মন নিমজ্জিত হত সে-কাহিনি নিয়েও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের লিখতে, ভাবতে হয়েছে।

এই গত দশকেই বোধহয়, অথবা তার একটু আগে, '৮০-'৯০-এর দশকে ফরাসি দেশে একটি কিশোরী তার বিবস্ত্র মন নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছিল, যার মধ্যে ছিল নিজের কামনার অনেক আগুনে-যাতনায়-আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কথা। এইসব আত্মকাহিনি লেখা নিয়ে সাহিত্যাকাশে ধূমকেতু আরও ইতিপূর্বে বহু দেখা গিয়েছে। পরবর্তীকালে তাদের লেখা আর নক্ষত্রমণ্ডলের দাবি নিয়ে উদিত হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাসে একটা লম্বা পাদটীকায় এঁদের সকলের নাম একত্রে থাকবে, হয়তো। অথবা, তপ্ত কটাহে ক্ষণিকের ফুটন্ত আবির্ভাব হিসেবেই তাঁদের নাম থাকবে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

এঁদের কথা বাদ থাকুক, স্বগতোক্তির বাক্‌শৈলীকে সাহিত্যরীতি হিসেবে অনেকেই ব্যবহার করেছেন। একেবারে আদিতে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে, তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎবাবু করেছেন, তাঁর 'স্বামী' উপন্যাসে। আমাদের বাংলায় আরও অনেক উদাহরণ দেওয়াই যায়। হয়তো তার উৎপত্তির কারণ নিহিত আছে রানি ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরেজি সাহিত্যেই। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'—সন্দীপ, নিখিলেশ এবং বিমলার অন্তরের নিভৃত অগ্নিদাহে জ্বলন্ত একটি উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের যেমন, তেমনই হয়তো বিশ্বসাহিত্যেরই এ একটি অমর সৃষ্টি।

উপরন্তু, রবীন্দ্রসাহিত্যের জগতে বারবার তো আমরা দেখেছি এই কাব্য-ছলনা, যাতে 'আমি' হয়ে তিনি লিখছেন, স্বকথনে, মগ্ন কবিতা। কম মগ্ন, কিন্তু আদরে ভরা তাঁর মায়ের অস্পষ্ট স্মৃতি-বিজড়িত কবিতাগুলোকেও তো বলা যায়, এক অর্থে—ডায়রি। অথবা, 'আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে, রাখিব জ্বালি আলো'। একটা সংকল্পের উচ্চারণ 'আমি' দিয়ে। তারই আর একটা সুর পাই সেই আত্মকথনে, গভীর হতাশার সুরে যখন তিনি লেখেন, বিলাসপুর স্টেশনে কেউ আর রুক্মিণী মেয়েটার খোঁজ রাখে না। অথচ, কবি খুঁজে মরছেন তাকেই, কেননা রুগ্ণ বিনু চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, 'এই দু'টি মাস সুধায় দিলে ভরে'। কিন্তু কবি জানতেন, তার মধ্যে ছিল রুক্মিণীকে নিয়ে বলা তাঁর নিজের একটা মিথ্যা উক্তি। সেটা শুধরাবার আর উপায় রইল না। একজন চলে গিয়েছেন ওপারে। আর একজন যে কোথায় গিয়েছে, কুলির বউ, রুক্মিণী, তার খবর কেউ দিতে পারে না।

এই স্বগত-ভাষণে দেওয়া ছোটর চেয়েও ছোট গল্পগুলো কি শুধুই অসাধারণ এক গল্পলেখকের রচনা? অথবা, তাঁর নিজের জীবনেরই টুকরো ছবি? গবেষণা করলে জানা যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা তো এখনও জানা হয়নি। তবে, বাঙালি হয়ে যে-ই জন্মেছে, যদি তার মুখেভাত হয়ে থাকে একশো বছর আগেও, সে জানে গান, কবিতা যা আছে 'সঞ্চয়িতা'-য় বাঁধানো, তার 'প্রকৃতি' অধ্যায়ে যা অন্তর্ভুক্ত, সে সমস্তের সব ছন্দই তাঁর দিনলিপি—বিশ্বকবির মুগ্ধ বিস্ময়, বাংলার মাটির দিকে তাকিয়ে।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডা য় রি ▲ ভাস্কর দেব

দিনগুলি, রাতগুলি (লিপিকে)

বিখ্যাত মানুষের ডায়রি কখনও আমাদের দেয় তাঁদের উড়ানের হদিশ। কখনও ঠিকানা দেয় তাঁদের আঁধারের। কখনও ঝলসে রাখে আমাদের সাধারণতা।

মীমাংসার কথাটা শুরুতে বলে নেওয়াই ভাল।

লেখালেখির যতরকমের সাহিত্য-ফর্ম রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র ডায়রিতে মনের ত্যারচা নেগেটিভগুলো সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কারণ, ডায়রি লেখার জন্য কখনওই আলাদা করে সে-অর্থে কোনও 'টেকনিকাল এফর্ট' দিতে হয় না। একটা দিন এল, আরেকটা দিন চলে গেল, চাঁদ উঠল-সুয্যি ডুবল, মাঝখানে যা কিছু রইল পড়ে—অর্থাৎ একটা আস্ত বেঁচে-থাকা; সেই বেঁচে-থাকার আকুতি, উদ্বেগ, অনুশোচনা কিংবা গতানুগতিক একাকিত্ব—সবই ডায়রির বিররণে, রি-কালেক্টেড ইমোশনস বা ডি প্রোফান্ডিস স্টেটমেন্ট হিসেবে, দিব্যি কুলিয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটা একইসঙ্গে ভীষণ অবজেক্টিভ, আবার চূড়ান্তরকমের অতিব্যক্তিগত উন্মোচন। এবং হয়তো সে-কারণেই বিখ্যাত মানুষদের ডায়রি পড়তে, নেড়েঘেঁটে তার ওম নিতে আমাদের ভেতরের মাধ্যাকর্ষণ এত অদম্য, এত প্রবল হয়ে ওঠে।

ক) 'ঘরের মেঝেতে একটা ফুরফুরে নীলচে আলো কোনাকুনি এসে পড়েছে। ও কীসের আলো? স্ট্রিটলাইট নয়, এটা চাঁদ। এমন একটা রাতে ইচ্ছে করে আমার বয়স আরও কমে যাক; যেন আরও তরতরে তন্বী হয়ে উঠি আমি। ইচ্ছে করে অক্ষতযোনির নম্রতা ফিরে পেতে, নতুন করে কারও দ্বারা অধিকৃত হতে।'

দি জার্নাল অফ সিলভিয়া প্লাথ, জুলাই ১৯৫০

খ) 'সেই শুক্রবার থেকে বিছানায় শুয়ে রয়েছি। রক্ত আমাশা হয়েছে আমার। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পিঁচিয়ে-খিঁচিয়ে মাঝেমধ্যেই পেটের ব্যথাটা উঠছে।... ডাক্তার বলেছে টানা বিশ্রাম নিতে। আশপাশের জগতের সঙ্গে, বলা উচিত সমাজের সঙ্গে, এই মুহূর্তে আমার কোনওরকম সংযোগ নেই।... হ্যাঁ, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের জন্য অসুস্থতার চেয়ে প্রকৃষ্ট অজুহাত আর হয় না। আমিও বহু আমন্ত্রণ এই ছুতোয় ফিরিয়ে দিলাম। দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করছি না। এমন সুদীর্ঘ, নিরুপদ্রব অবসর পেয়ে আমি যে কত খুশি কী বলব! মনে হচ্ছে, এবার আমি টমাস মান-এর ম্যাজিক মাউনটেন্ট-টা শেষ করে ফেলতে পারব।...

গতকাল পল ভালেরি এসেছিল। ও ফের পুনরাবৃত্তি করে গেল সেই কথাটার, যে, অনেক দিন ধরেই ও লিখছে স্রেফ টাকার জন্য।'

দি জার্নাল অফ আঁদ্রে জিদ, ২৮ অক্টোবর ১৮৯৩

গ) 'নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি : ... মনোজ বসু কেমন লেখেন? উত্তর পাই : তাঁহার লেখার হাত বেশ মিষ্টি। কিন্তু পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটিবার শক্তি তাঁহার নাই।

প্রশ্ন : বুদ্ধদেব বসু?

উত্তর : ইনি বিদেশীর মতন বাংলা লেখেন। যিনি এতদিনেও নিজের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তাঁহার লেখা পড়িতে ভাল লাগে না।'

মণ-কণিকা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০ অগাস্ট ১৯৫০

ঘ) 'প্রশ্ন : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত?

উত্তর : কল্পনা আছে, সংযম নাই; উদ্ভাবনীশক্তি আছে, versimilitude নাই, ... ইনি বাংলা ভাষায় অসংখ্য শব্দ আয়ত্ত করিয়াছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বিশুদ্ধ well-balanced পদ লিখিতে পারেন নাই।...

প্রশ্ন : প্রেমেন্দ্র মিত্র?

উত্তর : শক্তিমান লেখক। প্রতিভাবান লেখকের যতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন সবগুলিই আছে... কেবল একটি বস্তুর অভাবে সব কিছু ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধৈর্য নাই।...'

মণ-কণিকা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ অগাস্ট ১৯৫০

ঙ) "বেঁচে থাকার ছলনা এই কি যে কিছুই সময়মতো ঘটে না—অনেক আগে-পরে ঘটে, কল্পনাতীত ব্যাপারগুলো তখনি ঘটতে থাকে যখন আর কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই। বাবার শ্রাদ্ধের বাৎসরিক দিন যাব। বৌ মেয়ে ভোরেই চলে গেছে। বেলের শব্দে জেগে উঠে বারান্দা থেকে দেখি বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মেয়েটা—প্রতিমা। বুঝি যাওয়া হল না।

পনের মিনিটের মধ্যে তাকে ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে আসি—সে আমার চোখে বালিশ চাপা দিয়ে আমাকে চুষে দেয় আমারই অনুরোধে। 'বাছুরকে যেমন চাটে তেমনি করে চেটে দাও।' সে চাটে। খুবই আদর করে আরামের সঙ্গে সে আমার কথা রাখে,... সে চোখ বুজেছিল আগাগোড়া। তার খুব খারাপ লাগছিল বোঝা যায়।...

রোজিটা অন্ধকারে কী করছিল দেখিনি। সে যেন শিশির ফেলছিল লিঙ্গের মুখে।

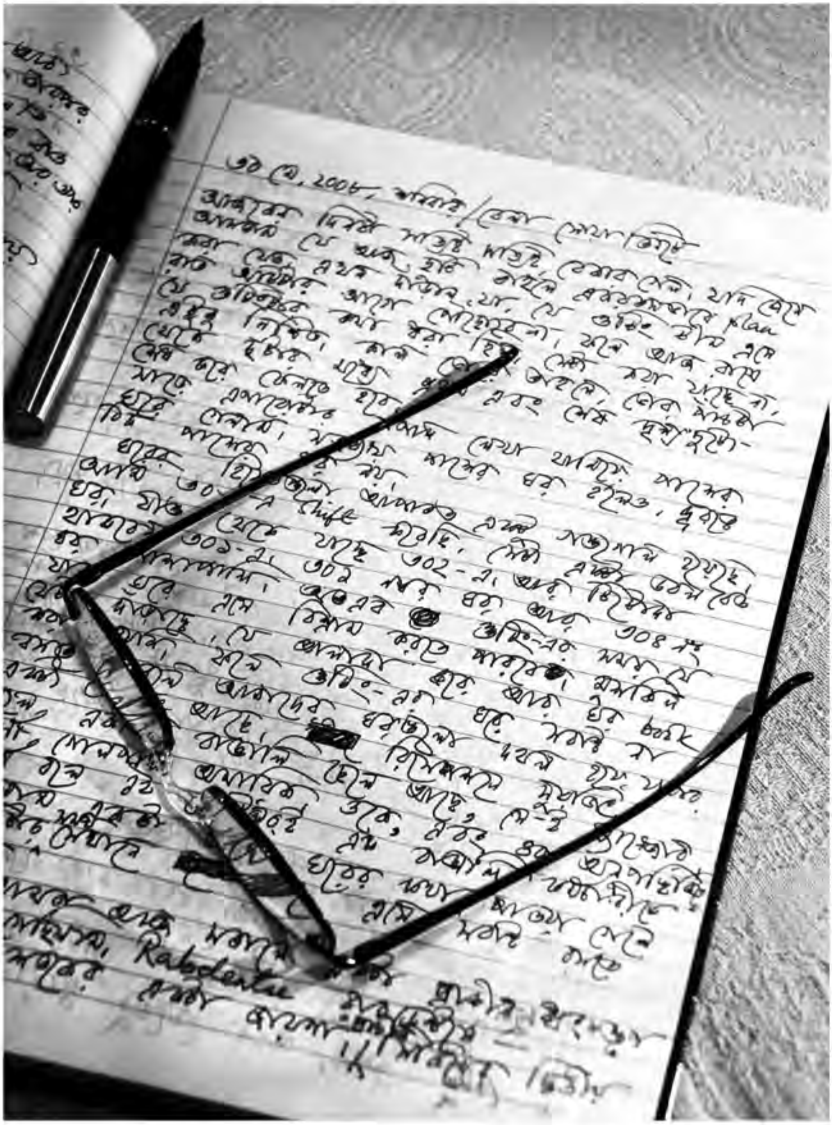
যাইহোক, এ-সব যে কোনোদিন ঘটবে তা জানা ছিল না। রোজিটাই প্রথম মেয়ে যে suck করে—৪০ বছর পেরিয়ে গেল—to get sucked—কেমন লাগে জানতে, যা জানা উচিত ছিল ১৬ বছর আগে। এভাবে দেরিতে—দেরিতে—সবই বড় দেরিতে।"

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি, ২৫ মার্চ ১৯৭৮

চ) "এই আরেক কাণ্ড প্রাইজ! কতরকম প্রতিক্রিয়া হয় কত মানুষের! এলিয়ট বলেছিলেন, প্রাইজ পাবার পর, 'এখন আর কেউ কবি বলে ভাবে না আমাকে, ভাবে এক সেলিব্রিটি।' জিদকে বলেছিলেন, সার্ত : 'আর তো পাবার কিছু নেই, কিছু হারাবারও নেই আপনার? এবার নিশ্চয় স্বাধীন আপনি, যা-খুশি তাই লিখতে পারেন?' স্বাধীন? কিন্তু জিদের মনে হয়েছিল যে এই খ্যাতির দায় বাঁচানোয় মস্ত একটা ভারের মতো। আবার এই জিদই এক যুগ আগে গর্বিত অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন মানকে তাঁর পুরস্কার পাওয়া নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু না, যে-কোনো কথা থেকেই রবীন্দ্রনাথে গড়িয়ে আসবার এই অভ্যাসটা ভালো না।'

শঙ্খ ঘোষ, জার্নাল, ১৯৭৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীনাথ ভাদুড়ি। কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং, চার্লস ডারউইন। লুইস ক্যারল, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। হ্যারি ট্রুম্যান, চে গুয়েভারা। ফ্রানৎস কাফ্‌কা, সালভাদর দালি। জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন। বিশিষ্ট ডায়রি-লিখিয়েদের তালিকাটি নেহাত ছোট নয়। এঁদের কেউ ডায়েরি লিখতে-লিখতেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। কেউ আবার সুপরিচিতি পেয়েছেন মৃত্যুর পরে। কেউ কলম বেয়েছেন তো বেয়েছেন একনাগাড়ে সম্পূর্ণ জীবদ্দশা, কেউ লিখতে-লিখতে এক-দু'মাস-বছর থেমেছেন, স্বেচ্ছায়। কেউ ডায়রি লিখেছেন সচেতন প্রেরণায়, ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা জেনে-বুঝে। কেউ ডায়রি লিখেছেন অত্যন্ত গোপনে, আপনতোড়ে, খেয়ালখোলা উদ্দাম ভঙ্গিতে; চেয়েছেন তাঁর চোখ বোজার সঙ্গে-সঙ্গে ডায়রিগুলোও যাতে পুড়েঝুড়ে চিরতরে খাক হয়ে যায়, প্রকাশিত হওয়ার কপিরাইট কভু না-পায়।



চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রবণতা ও মেথডলজি-র এরকম এস্পার-ওস্পার প্রভেদ সত্ত্বেও সব বিখ্যাত মানুষের ডায়রিই কিন্তু একটা অভিন্ন ইস্পাতশাণিত প্রত্যাশায় পাঠককে নিরন্তর চাগিয়ে রাখে। আমরা সবসময় চাই যে : সাহিত্য-শিল্প-বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিমণ্ডলে, পেশাগত কর্মব্যস্ততার আবহে, রোজকার সামাজিক মুখোশে-মুখচ্ছবিতে নক্ষত্রপ্রতিম মানুষগুলোকে আমরা যেমন-যেমন চিনি, যতটা করে চিনি—এঁদের ডায়রি পড়তে-পড়তে যেন তার অতিরিক্ত অন্য কোনও একটা আইডেন্টিটি, নতুন কোনও মাত্রা বা মহাদেশ, অভাবিত কোনও দাঁড়ের শব্দ বা জন্মের জড়ুল আচমকা হুড়মুড়িয়ে আমাদের সামনে চলে আসুক। এঁদের জীবনের কোনও একটা পর্দা, যা এতদিন ধুলোঢাকা অগোচরে ছিল—সহসা ঝিকিমিক করে উঠে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও আমাদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসটাকে ভোঁতা করে দিক।

অন্যের ওপর অপরিসীম রাগ-ক্ষোভ-ঈর্ষা। নিজের ওপর অক্লান্ত ঘেন্না-ভালবাসা-বিরক্তি। প্রতিবেশীর যৌনকেচ্ছা নিয়ে চুলবুলে ঔৎসুক্য। নারীর প্রতি আনসেন্সর্ড লোভ। টাকাপয়সা নিয়ে অসন্তোষ। গুপ্তশত্রুতা বা কনস্টিপেশনের ফালাফালা

সমস্যা। এ ধরনের তেল-চপচপে অনুভূতির কথা সমাজের পুলিশগিরির চাপে, পাঁচজনের উপস্থিতিতে, সচরাচর প্রকাশ করা যায় না। খ্যাতনামা মানুষদের তো আরও জ্বালা, ঘরে-বাইরে স্থানাঙ্ক ধরে রাখার পুতুলখেলা না চাইলেও তাঁদের চোয়াল-চেপে খেলে যেতে হয়। সেহেতু আমরা প্রাণপণ চাই যে : জীবনপ্রয়াসের খোলামেলা যা-ইচ্ছে-তাই উল্লেখটুকু, অন্তত ডায়রিতে যেন, প্রত্যয়িত নকল-সহ লিপিবদ্ধ থাকে। এই তো সে-ই একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লভূমি যেখানে নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি, অকপট স্বগতোক্তি, বিতর্কিত আনপ্রেডিকটেবল টীকাটিপ্পনি-রা প্যাড-গ্লাভস না-পরে, হেলমেট ছাড়াই সারবদ্ধভাবে মাঠে নামে, নেমে অকুতোভয়ে চালাতে আরম্ভ করে। আর এই স্পর্ধা, এই দুঃসাহসের গুণেই বিখ্যাত মানুষদের ডায়রি হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র, সম্ভাবনাময়, অত্যুজ্জ্বল। শুধু তাই নয়—কোনও একটা উথালপাথাল ঘটনার প্রসঙ্গ, কোনও একজন চরিত্রের ধারাভাষ্য, একটা প্রেম-অপ্রেম-খুনোখুনির বৃত্তান্ত কোনও লেখকের কলমে বা শিল্পীর ক্যানভাসে যেভাবে রূপায়িত হয়, সেই মানুষটির ডায়রি পড়ার সময় আমরা ওই ঘটনাটার সূচিমুখ খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। অপার কৌতূহলে, ট্রুথ জানার আগ্রহে তন্নতন্নিয়ে সন্ধান করি সেই ছায়াপুতুলটিকে—যার খড়কুটো দিয়ে শিল্পের চরিত্রটির ফুসফুসে, ধমনীতে রক্তসঞ্চার করা হয়েছে।

অর্থাৎ মোদ্দা সম্প্রসারণটি হল : বিখ্যাত মানুষদের ডায়রি আমাদের দিতে পারে একের-পর-এক অনন্ত সমান্তরাল সরলরেখা যারা কখনও পরস্পর কাটাকুটি করবে না, অথচ প্রত্যেকেই ছুটে চলছে অদ্বিতীয় মোহনার দিকে, সমর্পণের ইচ্ছায়। সেই প্রবহমানতা থেকে আমরা আপাতত ছেঁকে নিলাম এক-দু'জন প্রখ্যাত নারী-পুরুষের বার্থ অ্যান্ড বিকামিং-এর ঝংকার, তাঁদের মননের মধু, তাঁদের স্ট্যান্ডপয়েন্ট, আপৎকালে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা দেওয়ার চুম্বকগুলি।

ডায়রি অফ আ জিনিয়াস

৩ জুলাই, ১৯৫২

প্রাতরাশের মিনিট পনেরো পরেই, কানে একটা জুঁইফুল গুঁজে যথারীতি চলে গেলাম শৌচাগারে। বসতে-না-বসতেই পুরীষমোক্ষণ এবং প্রায় গন্ধহীন। এতটাই যে, আমার সুগন্ধি টয়লেট পেপার এবং কানে-গোঁজা জুঁইফুল হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশের অবিসংবাদী শাসক। গতরাতের এক অতিমনোরম স্বপ্নে আমি এই ঘটনার পূর্বাভাস পাই, আমার ক্ষেত্রে তা মসৃণ ও দুর্গন্ধহীন কোষ্ঠ-পরিষ্কারের দ্যোতনা বহন করেছিল।... এর কৃতিত্ব দেওয়া যায় আমার প্রায়-সুশৃঙ্খল জীবনযাপনকে। আমার বয়স যখন মাত্র একুশ—মাদ্রিদে লোরকা ও বুনুয়েলের সঙ্গে আমার অনৈতিক জীবনধারার সেই দিনগুলো আজ আমি ঘোর অতৃপ্তির সঙ্গে স্মরণ করি। সে-সময় আমার কোষ্ঠ মোটে পরিষ্কার হত না। প্রক্রিয়াটি ছিল অবর্ণনীয়, খিঁচুনি আনা, ছোঁয়াচে রকমের লজ্জাজনক, অনিয়মিত, নারকীয়, অস্তিবাদী...। আর তুলনায় আজ তা কতই মোলায়েম—যেন ব্যস্ত প্রজাপতির মধুসঞ্চয়।

আমার এক মাসি ছিলেন, মলত্যাগ ও পুরীষবিষয়ক যে কোনও কিছুতেই তাঁর আশ্চর্য আতঙ্ক ছিল। তিনি যে কখনও বায়ুনিঃসরণ করতে পারেন, এই চিন্তাতেই তাঁর চোখ ভরে আসত জলে। তাঁর সম্মান যেন নির্ভর করত জীবনে কখনও বায়ুনিঃসরণ না-করার ওপরে। আগে তাঁর কীর্তিটা আমার কাছে যতটা আকাশছোঁয়া মনে হত, আজ আর তা হয় না। এ-কথা সত্যি, আমার এই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুতীব্র আধ্যাত্মিক জীবনে, মনে করে দেখি, আমিও ইদানীং এ-কাজ আদৌ করি না।... প্রাচীন গ্রন্থে অনেকবারই পড়েছি, সাধুসন্তরা মলত্যাগ করতেন না। বিশ্বাস ও পাপহীন ধারণাবশত তাঁরা বাস করতেন স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে, বিপুল আনন্দের মধ্যে। এখন তা সত্যের অনেকটা কাছাকাছি মনে হয়।

এই অমিত প্রতিভাধর লিপিকারের নাম সালভাদর দালি। সেই 'এক্সেন্ট্রিক পলিম্যাথ জিনিয়াস'—যিনি আধুনিক চিত্রকলার ভাঙাগড়ার ইতিহাসকে, কুইক্‌জোটিক উড়ালচেষ্টাকে একার চেষ্টায় একশো আশি ডিগ্রি আলাদা ডায়মেনশন দিয়েছিলেন। ১৯৫২ থেকে '৬৩ সাল অবধি প্রায়-নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি ডায়রিতে এন্ট্রি লিখেছেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা, নিবিড় উপলব্ধি, অবিশ্বাস্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এবং ভাবনা-ভাষার টলটলে প্রসাদগুণ তাঁর ডায়রিকে এনে দিয়েছে সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্লাসিকের মর্যাদা। জে জি ব্যালার্ডের মতো কোনও কোনও সমালোচক আবার দালির ডায়রিকে বিবেচনা করেছেন সুররিয়াল আন্দোলনের একটি 'সেমিনাল টেক্সট', মৌলিক আকর হিসেবে।

কী-কী বিষয়ের না অবতারণ করা হয়েছে এখানে? একদিকে নিজের শিল্পদর্শন, নন্দনচিন্তা, সৌন্দর্যবোধ। অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ, শৈশবের আলোছায়াকুয়াশা, যৌবনের অবসেশন। অন্তর্বর্তী বুনিয়াদে স্তরে স্তরে ঠাঁই পেয়েছে নিজের শারীরবৃত্তীয় হালচালের অনুপুঙ্খ ডিটেল—তাঁর ঘুম, হজম-পরিপাক, ঠান্ডা লাগার ঠকঠকানি, নিস্তেজ পুরষাঙ্গ, কখনও বা চাকুর মতো সুতীক্ষ্ণ যৌনতা। আবার স্রেফ দিন-আনি, দিন-খাই গোছের পাতি-সাধারণ রুটিন যে এড়িয়ে গিয়েছেন, তাও নয়। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই অন্তর্দৃষ্টির ধাঁধানো ফোকাসে এ-সব ছোটখাটো ঘটনার ঝিনুক ফেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনির্বচনীয় প্রাপ্তির একেকটা কোহিনুর, নীলা, মুক্তো। বইটিকে তিন ফুট জমির গভীরে নিপাত দিলেও, আমার-আপনার ঘরের বাঁধাবুলি রক্ষা পাবে, পলস্তারা খসে পড়বে না—সেই গ্যারান্টি দেওয়া ভার।

মে, ১৯৫২

প্রথমবার নিৎশে পড়ার অভিঘাতটি নিদারুণ। আমি ভয়ানক অবাক হয়েছিলাম পড়ে।... একজন এত জোরের সঙ্গে কী করে বলছে : ঈশ্বর মৃত! এতদিন আমি জানতাম, ঈশ্বর বলে কারও অস্তিত্ব নেই, আর এখন কিনা একজন আমাকে বলছে তিনি ইতিমধ্যে মৃত। সেই প্রথম আমার ভেতরে দ্বিধার জন্ম হল।

৫ জুলাই, ১৯৫২

প্রিয় কবি লাঁতে, যাঁর জন্য একসময় আমি অনেক করেছি, সেদিন আমাকে একটি গণ্ডারের শিং উপহার দিলেন। গালাকে বলেছিলাম, 'এই শিং আমার জীবন বাঁচাবে একদিন।'

আজ সেই কথা সত্যি হতে চলেছে। খ্রিস্টের ছবিটা আঁকার সময় লক্ষ করলাম, তিনি যেন পুরোপুরি গণ্ডারের শিং দিয়েই নির্মিত। ঘোর লাগা মানুষের মতো আমি তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আঁকলাম। সবটাই যেন গণ্ডারের শিং।... নিজের আবিষ্কারে নিজেই মোহিত হয়ে খ্রিস্টকে ধন্যবাদ জানালাম। এ কোনও রূপক নয়। প্রকৃত দিব্যোন্মাদের মতো আমার স্টুডিওতে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন।

ইতিহাস জুড়ে দেখা গিয়েছে শিল্পীরা রূপের সন্ধানে নিজেদের ক্ষয় করে ফেলেছেন, চেষ্টা করেছেন তাকে প্রাথমিক জ্যামিতিক আয়তনে বেঁধে ফেলতে।... ডিম আঁকায় লিওনার্দো অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ইনগ্রেস ভালবাসতেন গোলক, আর সেজানের পছন্দ ছিল ঘনক এবং চোঙ। কিন্তু গণ্ডারে আগাগোড়া আচ্ছন্ন দালি একমাত্র সত্য খুঁজে পেয়েছেন ভণ্ডামির অকস্মাৎ খিঁচুনিতে।

৬ জুলাই, ১৯৫২

অসহ্য গরম। গ্রামাফোনে সশব্দে বাখ বাজালাম।... সন্ধে নাগাদ দক্ষিণ থেকে একটা উষ্ণ হাওয়া বইল।... চিংড়ি মাছ ধরে ফিরে এসে গালা আমার কাছে পরিচারিকাকে পাঠাল, সূর্যাস্তের দিকে আমি যেন একবার তাকিয়ে দেখি। সমুদ্র প্রথমে প্রবালবর্ণ, পরে উজ্জ্বল হলুদ। জানলা দিয়ে ইশারা করে আমি তাকে জানালাম যে সবই আমার নজরে পড়েছে।... গালাকে দেখে মনে হল—জীবনে সবচেয়ে সুন্দর তাকে আজই লাগছে। রাফায়েলের ছবির মতোই সুন্দরী গালার জন্য আমি ঈশ্বরকে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

৮ জুলাই, ১৯৫২

দুই নির্বোধ প্রযুক্তিবিদ আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পাহাড়ে উঠতে উঠতে তাদের বক্তব্য শোনা গেল। পাইন গাছ কেন পছন্দ, তা একজন আরেকজনকে ব্যাখ্যা করছিল, 'পাইন গাছ আমার ভারি ভাল



লাগে, ছায়ার জন্য নয়, পাইন গাছ দেখতে সুন্দর বলে। গরম কালে পাইন গাছ দেখতে না-পেলে আমার মনেই হয় না যে, গরম কাল এসেছে।'

শুনে মনে-মনে বললাম, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—তোমাকে আর তোমার পাইন গাছকে।'

ওই দু'জনের সঙ্গে যথেষ্ট সৌজন্যমূলক ব্যবহারই করলাম। কষ্ট করে সাটামাটা কথাও বসে গেলাম। তারা কৃতার্থ হয়েছে, মনে হল।

যাওয়ার সময়, বারান্দায় দেখি তারা আমার অতিকায় হাতির করোটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—ওটা কী?

—হাতির খুলি। আমি দারুণ ভালবাসি। বিশেষত গরম কালে। হাতির করোটি বাদ দিয়ে গরম কাল আমি ভাবতেই পারি না।

১৪ জুলাই, ১৯৫২

আমি দু'জন নাইটের স্বপ্ন দেখি,... দু'জনই নগ্ন,... একদম একইরকম দু'টি রাস্তা দিয়ে তারা প্রবেশ করছে।... একটা পথ নিবিড় পার্থিবতায় আলোকিত, আরেকটা রাফায়েলের 'কুমারীর বিবাহ' ছবিতে যেমন—অত্যন্ত স্বচ্ছ তরল—।...উভয় নাইটই, দালি। একজন গালার সম্পত্তি, আরেকজন তাকে বিলকুল চেনে না।

ফ্রানৎস কাফকার ডায়রি

দু'রকম ফোর্স আছে, যা মানুষকে তার অতীত থেকে, আগের এক-একটা অতিবাহিত মুহূর্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় : একটি বিস্মৃতি, আরেকটা স্মৃতি। এই দু'টি ফোর্স—স্মৃতি এবং বিস্মৃতি—একইসঙ্গে কাজ করে। বিস্মৃতির কাজ সব কিছু মুছে ফেলা, জ্বলন্ত-জ্যান্ত সব কিছুর বিলোপ ঘটানো। আর স্মৃতির কাজ উল্টো, প্রতিটা মুহূর্তকে রূপান্তরিত করে নতুন কোনও বাঁকের দিকে ঠেলে দেওয়া। ফলাফল একই : মানুষ তার অতীত থেকে, আগের এক-একটা অতিবাহিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইদানীং কালে ফ্রানৎস কাফকার ডায়রি যখনই যেটুকু পড়েছি, মিলান কুন্দেরা-র মন্তব্যটা প্রতিবার অল্পস্বল্প মুখ দেখিয়ে গিয়েছে।

কেন, কী আছে এই ডায়রিতে? এক অর্থে কিছুই না—এক অতল, অবিসংবাদী অ্যালিয়েনেশন ছাড়া, যা কাফকাকে অপ্রতিরোধ্য নিয়তি-ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে এমন এক দুরূহ অস্থিরতার মধ্যে যেখানে ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কার্য-কারণের যোগাযোগটা একেবারেই স্পষ্ট নয়। কী হচ্ছে, কেনই বা হচ্ছে, কার আদেশে হচ্ছে কেউ তার হদিশ রাখে না। বলা ভাল, সব কিছুই বিলীন, ঝাপসা। আবার, আরেকভাবে দেখলে, কাফকার ডায়রির মধ্যেই লুকনো রয়েছে তাঁর অস্তিত্বের ক্ষয়ক্ষতিসংশয়, সাহিত্যিক নজরটান ও আত্মনির্মাণের তাগিদ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ মেটামরফসিস, এবং অজানা এক তাড়নায় সম্পূর্ণ নতুন কোনও এক উপসংহারের দিকে পরোয়াহীন ছুটে চলা। ১৯১১ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের এই এন্ট্রি-টা যেমন :

আমি কোনও কিছুই শেষ করি না। কেননা, আমার সময় থাকে না, এবং তা আমার উপরে বেশ চাপ সৃষ্টি করে। যদি সারাটি দিন মুক্ত থাকতে পারতাম এবং এই সকালের অস্থিরতা আমার মধ্যে ভরদুপুর অবধি বাড়তেই থাকত, এবং সন্ধের দিকে আপনাআপনিই বিদায় নিত, তা হলে আমি ঘুমোতে পারতাম। এইভাবে, যাইহোক, এই অস্থিরতা আমাকে সর্বোচ্চ একঘণ্টা গোধূলি সন্ধ্যার ঝলকটুকুই দিয়ে যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ভাবে আমার রাত্রিকে সংক্ষিপ্ত করে।... এরকম ঘটে চলার পিছনে কি কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে? আমি কি তা হলে আরও সময় পাব?

এরফুর্টে রয়্যাল টেবিলে বসে নেপোলিয়ন স্মৃতিচারণা করছেন : যখন আমি ফিফ্‌থ রেজিমেন্টের সামান্য একজন লেফটেন্যান্ট ছিলাম... (রাজরাজড়াগণ বিহ্বল হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করলেন, নেপোলিয়ন এটা লক্ষ করলেন এবং নিজেকে সংশোধন করে নিলেন)... যখন সামান্য লেফটেন্যান্ট হিসেবেও আমার সম্মান ছিল... যখন আমি এই ক্ষুদ্র সত্য কাহিনীর কথা ভাবি আমার ঘাড়ের শিরাগুলি গর্বে ফুলে ওঠে। আমি সহজেই তা অনুভব করতে পারি এবং তার ফলে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়।

—সমগ্রের অংশ হিসেবে না-দেখে, অসংলগ্ন মনে পাতা উল্টাতে-উল্টাতে যদি এই 'নোট' পড়া যায়, তা হলে কি সত্যিই বুঝতে পারা যাবে কেন কাফকা আজকাল কিছুই 'শেষ' করতে



পারেন না? কেন তাঁর এই অস্থিরতা? যা ঘটছে তা ঘটা উচিত নয় এমন ইঙ্গিত আছে, যদিও এরকম কেন ঘটছে তার কারণ কাফকা নিজেই জানেন না। আবার শেষভাগে ইতিহাসের একটা 'ক্ষুদ্র সত্য কাহিনীর কথা' ভেবে তিনি যেভাবে রোমাঞ্চিত হয়েছেন, তার কারণও কি একটা ঝটিকা-পাঠে বোঝা যায়? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা বরং এর ঠিক আগের দিন, ১৬ অক্টোবর ১৯১১-র একটা নির্বাচিত অংশ পড়ি :

মি. এইচ-এর কামরার উপরে এবং নীচে, একটি কুকুর তার পায়ের থাবা দিয়ে আলতোভাবে আমার পায়ে কুঁইকুঁই করছিল। আমি তাকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলাম।... বাচ্চাকাচ্চা, মুরগি, এখানে-সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক কিছু ছেলে। একটি শিশুর পরিচারিকা কখনও কখনও পাওলাত্স্কি-র (চেক ভাষায় পাওল্যাক শব্দটির অর্থ ঝুলোনো বারান্দা...) রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে কিংবা কখনও একটি দরজার পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

আমি জানি না তাঁর এই দৃষ্টিতে আমি কী? বা কীরকম? উদাসীন, দায়গ্রস্ত, হতবুদ্ধি, বিহ্বল, যুবক? নাকি বৃদ্ধ? ধার্মিক? নাকি দাম্ভিক? হাত দুটি আমি বাড়িয়ে রাখি নাকি পিছনে রাখি? জীব-জানোয়ার ভালবাসি? নাকি মানুষ? এইচ-এর বন্ধু? নাকি সনির্বন্ধ আবেদক, তাঁদের থেকে ভালো, যাঁরা ওই ভিড়ে জড়ো হয়েছেন, যাঁরা কখনও কখনও পানশালা থেকে পিসেরোর দিকে যান এবং একইভাবে ফিরে আসেন, নাকি তাঁদের কাছে আমি হাস্যকর আমার পাতলা পোশাকের কারণে? ইহুদি নাকি খ্রিস্টান? কী? বা আমি কেমন?

চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। এবং বেড়ানোর মধ্যেই, আমার নাক মোছা, মাঝে মাঝে প্যান-এর কোনও সংখ্যা পড়া, এই ভয়ে পাওলাত্স্কি এড়িয়ে চলা যে, যদি আমি ওই রেলিংয়ের দিকে তাকাই এবং সেখানটা শূন্য দেখি?...

এবারও মন্তব্য বাহুল্য। শুধু চোরাই-লণ্ঠনের মতো সংকেত দোলানো, আর ছেঁড়া চিরকুটের অর্ধেকের সঙ্গে বাকি অর্ধেক-ছিন্ন কাউন্টারপার্ট মিলিয়ে নেওয়া। শুধু বলার যে, বিস্মৃতি ও স্মৃতি কীভাবে একইসঙ্গে মানুষকে নাভির তলায় ছুঁয়ে যায়, কীভাবে নিজের থেকে নিজেকে অকস্মাৎ ভুলিয়ে দেয়, এবং নিজেকে নিজের থেকে রূপান্তরিত করে গোপনীয় আতসকাচের নীচে ধরে, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত হতে পারে এই বর্ণনাটুকু।

কাফকা ডায়রি লিখেছেন জার্মান ভাষায়। ১৯১০ সাল থেকে তিনি এন্ট্রি নথিবদ্ধ করতে শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ২৭ বছর। এরপর টানা লিখে গিয়েছেন ১৯২৩ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর একবছর আগেও। দিনলিপি হিসেবে যা পাওয়া যায় তা নোটবইয়ের আকারে মোট ১৩টি খাতা। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই চারটি নোটবইয়ে পৃষ্ঠার ক্রমনম্বর সত্ত্বেও রোমান হরফে সংখ্যাগুলো উল্লিখিত হয়েছে। কখনও নোটবইয়ে শেষ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে প্রথম পৃষ্ঠার দিকে এসেছেন, কখনও শুরু থেকে শেষের দিকে। ফলে, অনুবাদকদের পক্ষে ক্রমপর্যায় রক্ষা করা মুশকিলের হয়েছে। দিনক্ষণতারিখ সুশৃঙ্খল নয়। কখনও-বা, নোটবইয়ের কিছু পাতা নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবু, কাফকার ডায়রি ইন্ধনিক—একজন জাত-লেখকের আইডিয়া, কল্পনা, স্বপ্নের তীরচিহ্নগুলোকে অব্যর্থ চিনিয়ে দেয়। বলা হয়, কাফকার লেখা পড়া উচিত কোনওরকম পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বাদ দিয়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা আর কতটা হয়? বাবার সঙ্গে তাঁর ভীতিপ্রদ সম্পর্ক, সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের ধারাবাহিক ইচ্ছে ও ব্যর্থতা, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য-রুগ্‌ণতা, চারপাশের পরিসরে প্রভুত্বের রক্তচক্ষু, আমলাতন্ত্রের নখদন্ত, তাঁর পলায়নপর মনোবৃত্তি, তাঁর ভাবনার অ্যাবসার্ডিটি, তাঁর ইহুদিত্ব-নাস্তিকতা, তাঁর বাসনা, নৈতিক পিছুটান—পড়া শুরু করলে এ-সবই আমাদের মনের মধ্যেকার খনিজে হইহই করে আলো ফেলে; আমরা বুঝতে পারি, এই 'এন্ট্রি'-রা কী ভীষণ বিপজ্জনক; বুবি ট্র্যাপের মতো, ঘুমিয়ে-থাকা আগ্নেয়গিরির মতো, ডায়রির পরতে-পরতে তারা অসীম স্থৈর্যে অপেক্ষা করছে, গা-এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কেবল যে কোনও সময় একবার বাঁশিতে ফুঁ দিলেই হল :

১৯ ডিসেম্বর, ১৯১০

'অপিসে কাজ করতে শুরু করলাম। বিকেলে ম্যাক্স-এর বাড়ি গিয়েছিলাম। গ্যয়টের ডায়রির সামান্য কিছু অংশ পড়লাম। দূরত্ব যেন এই জীবনটাকে ইতিমধ্যেই মন্থর করে ফেলেছে, এই দিনলিপিতে তা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত ঘটনার স্পষ্টতাই যেন ঘটনাগুলিকে রহস্যময় করে তুলেছে। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে দৃষ্টি ছুটিয়ে দিলে, বাগানের রেলিং যেমন সেই দৃষ্টিকে ব্যাহত করে, ঠিক তেমনই।... এইমাত্র আমার বিবাহিতা বোন, দেখা করার জন্য, এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন।'

৩০ অক্টোবর, ১৯১১

'যখন আমার পাকস্থলিটি বেশ স্বাস্থ্যসম্মত মনে হয়, খাবার নিয়ে সমস্ত দুঃসাহসী ভয়ানক কাজ করে ফেলার ইচ্ছে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে ঠিক তখনই এরকম সনির্বন্ধ প্রার্থনার ভার আমার মধ্যে জাগে। এই প্রার্থনা আমি বিশেষত পূর্ণ করি কোনও শুয়োরের কসাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। যদি কোনও কাবাব রোল আমার চোখের সামনে পড়ে..., তাতে কামড় বসাই, অবশ্য মনে মনে। এবং কল্পনাতেই এটির উপর আমি আমার সমস্ত দাঁতের দাগ বসিয়ে দিই, গিলে ফেলি, অতি দ্রুত, মেশিনের মতো।... এইভাবে আমি যে শুধুই আমার স্বাস্থ্যের ভালো অবস্থাটিকে উপভোগ করি তা-ই নয়, একইসঙ্গে আমার ব্যর্থতাহীন দুর্ভোগকেও উপভোগ করি। অতি দ্রুত আমি সেই অবস্থাটিকে পেরিয়ে যাই।'

১৪ নভেম্বর, ১৯১১

'অবিবাহিত থাকা ভয়ানক ব্যাপার।... বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য, বা কেউ আমন্ত্রণ জানালে তার সম্মান রক্ষার জন্য, বা কোনও আসরে একটি সন্ধ্যা কাটানোর ইচ্ছে হলে এই ভয়াবহতা এসে উপস্থিত হবে। কারও হাত দিয়ে দুপুরের বা রাতের খাবার আনিয়ে নিতে হবে। কাউকে শান্তশিষ্ট আস্থা-সহ প্রত্যাশা করা যাবে না।... কারও স্ত্রীর পাশাপাশি সিঁড়িতে ওঠা যাবে না।'

৫ জানুয়ারি, ১৯১২

'দু-দিন ধরে আমি লক্ষ করছি, যখনই আমি চাইছি, তখনই আমার মধ্যে শীতলতা এবং উদাসীনতা এসে যাচ্ছে। গত সন্ধ্যায়, বেড়ানোর সময়, রাস্তার

প্রতিটি ক্ষুদ্র শব্দ, সমস্ত দৃষ্টি যা আমার ওপরে নিবদ্ধ, শো-কেসের প্রত্যেকটি ছবি আমার নিজের থেকেও আমার কাছে বেশি জরুরি মনে হল।'

৬ মে, ১৯১৪

'এফ. এবং আমার জন্য, আমার বাবা-মা'র একটি সুন্দর ফ্ল্যাট দেখে রাখা উচিত; সুন্দর সারা বিকেলগুলো আমাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কাটাতে হয়। আমার আশ্চর্য লাগে, তাঁরা হয়তো আমাকে আমার কবরেও শুইয়ে দেবেন তাঁদের চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনটাকে সুখী করার পর।'

২৩ জুলাই, ১৯১৩

'রোস্টক-এ ফেলিসের সঙ্গে কাটল। মেয়েটির যৌন আবেদন যেন ফেটে পড়তে চাইছে। এটাই তাদের স্বাভাবিক অপবিত্রতা।'

—কাফকা 'দি জাজমেন্ট' গল্পটি লিখেছিলেন ১৯১২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে। আর ১৯১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ডায়রিতে এই এন্ট্রি লেখেন :

"'দা জাজমেন্ট'-এর প্রুফ আমি নিজে দেখেছি। ফলে, যে সমস্ত সম্পর্ক এই গল্পে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, যতদূর স্মরণে আছে, তার সমস্ত বিবরণ আমার লিখে রাখা উচিত। এটা জরুরি কেননা, গল্পটি আমার ভিতর থেকে, পার্থিব জন্মের মতোই বেরিয়ে এসেছিল, তার নোংরা, চ্যাটচেটে জলীয় পদার্থ ও আঁশটে গন্ধ-সহ। এবং আমার অভ্যন্তরে থাকার মধ্যে ছিল একটি হাত যা দিয়ে আমি ওই গল্পের দেহটিকে তুলে নিয়েছি। আর ছিল এই তুলে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছেটুকু :

পিতা ও পুত্রের মাঝে সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছেন এই বন্ধুটি, তিনি তাঁদের শক্তিশালী সাধারণ প্রতিশ্রুতি। নিজের জানলায় বসে একাকী গেয়র্গ ভীষণ ইন্দ্রিয়পরায়ণভাবে তন্নতন্ন করে খুঁজছেন এই চেতনায় যে তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাধারণ জিনিসটা কী? তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর মধ্যেই আছেন তাঁর বাবা।... গল্পটিতে পিতার চরিত্রটি বেশ দৃঢ় একটা ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছে।... পিতা ও পুত্রের ভেতরকার সাধারণ সম্পর্কটি পিতা নষ্ট করে ফেলেছেন... সে কারণে পাত্রীটিও পিতা ও পুত্রের মাঝের সম্পর্কের বৃত্তটিতে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছেন না।..."

গল্পকেন্দ্রিক এই স্বীকারোক্তি কি কাফকার নিজের জীবন নয়?

ডায়রি অফ আ ইয়ং গার্ল

আনে ফ্রাংকের ডায়রি এই নামেই পরিচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসি-জাগরণ, হলোকাস্ট, স্বৈরতন্ত্রের সাবভার্সিভ এফেক্ট—বয়ঃসন্ধির মুখোমুখি দাঁড়ানো এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ের মনে কীরকম শিরশিরে কাঁপুনি, হাড়-হিম ভয় বয়ে আনতে পারে, তার এর চেয়ে ভাল উদ্ভাসন বোধহয় হয় না।

৯ অক্টোবর, ১৯৪২

ডিয়ার কিট্টি,

আজ তোমাকে একটা খুব মুষড়ে পড়ার মতো খবর শোনাব। খবর পেয়েছি, আমাদের জানাচেনা বহু ইহুদি পরিবারকে ধরপাকড় করে ওয়েস্টারবর্ক-এর ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি, একটুও মানবিক সৌজন্য বা ভদ্রতা দেখানো হয়নি। গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া হয় যে-সব ট্রাকে, তাতে চাপিয়েই ওঁদের পাঠানো হয়েছে।... উফ, ওয়েস্টারবর্ক! শুনলেই বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। শুনেছি, সেখানে একটাই চান করার জায়গা, লোকের তুলনায় পায়খানা-ঘর অনেক অনেক কম। ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলে, বুড়ো-ছোঁড়া সবাই একইসঙ্গে গাদাগাদি করে শুয়ে-বসে থাকতে বাধ্য হন।... অনেক মহিলার বাচ্চা হবে শুনলাম। তাঁদের জন্য আলাদা কোনও বিধি-ব্যবস্থা নেই।... ওখানে কিছুদিন থাকলেই মেয়েরা নাকি গর্ভবতী হয়ে পড়ে!

২০ নভেম্বর, ১৯৪২

ডিয়ার কিট্টি,

আমরা কেউ জানি না কীভাবে এই খবরগুলোর মোকাবিলা করব। একটু আগে অবধি, যতক্ষণ ইহুদি-নির্যাতনের কোনও খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছয়নি, আমার ভাবছিলাম, যাকগে, তা হলে হাসিখুশি থাকাই ভাল।...

আনে ফ্রাংক ডায়রি লেখা শুরু করে ১৯৪২-এর ১২ জুন থেকে। আমস্টারডাম-এ ততদিনে নাৎসি বাহিনী ঢুকে পড়েছে। জার্মানি থেকে চুপিচুপি পালিয়ে-আসা শরণার্থী ইহুদিদের ওপর আস্তে-আস্তে ঘনিয়ে উঠছে বিপর্যয়ের মেঘবাদল। এবং ১২ জুনের এই প্রথম এন্ট্রি-র সপ্তাহ তিনেক পরেই আনে ফ্রাংকদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হবে বহুশ্রুত 'সিক্রেট অ্যানেক্স'-এ, সেখানেই চোরাগোপ্তা ভাবে কাটাতে হবে দীর্ঘ দু'বছর। আনে-ও ডায়রি লিখবে প্রায় ততদিন—১ অগাস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত।

তার মৃত্যুর পর, ১৯৪৭ সালে, বাবা অটো ফ্রাংক-এর উদ্যোগে ওলন্দাজ ভাষায় সেই ডায়রি প্রকাশিত হয়। প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৯৫২-তে।

২২ ডিসেম্বর, ১৯৪২

ডিয়ার কিট্টি,

অ্যানেক্স হাউস-এ খুশির হাওয়া। জানতে পারলাম, ক্রিসমাস উপলক্ষে প্রত্যেকে বরাদ্দের অতিরিক্ত কোয়ার্টার পাউন্ড মাখন পাবে। খবরের কাগজ অবশ্য বলেছে হাফ পাউন্ড। কিন্তু সেটা প্রাণ-বাঁচিয়ে পালিয়ে-বেড়ানো ইহুদিদের জন্য নয়। তাঁদের যে আর সরকারি রেশন কার্ড নেই। আটজন সদস্যের আটটা রেশন কার্ডের বদলে, আমরা চারটে কার্ড, অনৈতিক উপায়ে, খরিদ করতে পারব। আটজনের চার! হল কিনা কোয়ার্টার পাউন্ড।

আনে-র ডায়রির অধিকাংশ এন্ট্রি 'কিট্টি' নামের এক চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে শুরু হয়েছে। বিশেষণ হিসেবে লেখা হয়েছে 'ডিয়ার কিট্টি', বা কখনও 'ডিয়ারেস্ট কিট্টি'। থিওডোর হলম্যান-এর মতো কোনও কোনও সমালোচকের মতে, এই 'কিট্টি' একটি কাল্পনিক চরিত্র। ভন মার্কসভেল্ট-এর উপন্যাস থেকে ধার করা। আবার সিয়েৎসে ভন ডর হক মনে করেন, 'কিট্টি' আদৌ ফিকশনাল চরিত্র নয়। কিট্টি এগিয়েডি বলে ফ্রাংক পরিবারের একজন পরিচিতিকে এই নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কিট্টি যেই হোক, আমাদের সৌভাগ্য যে, আনে ফ্রাংকের ডায়রির সততা, তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, শাইনিং স্পিরিট কল্পনা ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্বমূলক ধাক্কায় আক্রান্ত হয়নি, বিন্দুমাত্র টোল খায়নি।

১০ অক্টোবর, ১৯৪২

নিজের এই ছবিতে আমাকে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি চাই আমাকে এরকমই দেখতে থাকুক বরাবর। তা হলে হয়তো হলিউডে আমার একটা চান্স থাকবে।...

১০ অগাস্ট ১৯৪৩,

ডিয়ার কিট্টি,

মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে। খাওয়ার সময় আমি নিজের সঙ্গেই কথা বলব, অন্যদের সঙ্গে নয়। এর দু'টো কারণ। প্রথমত, আমি যদি চুপচাপ থাকি, সর্বক্ষণ বকরবকর না করি, তা হলে সবাই খুশি হবে। দ্বিতীয়ত, আর পাঁচজনের ঘ্যানরঘ্যানর শুনে আমাকে বিরক্ত হতে হবে না। মনে হয় না আমি বোকার মতো ভাবছি।

লেখক কোনও অভিজ্ঞতার ভেতরে থেকে লিখতে পারে না। যাই লিখুক, যেমনই লিখুক, লিখতে গেলে অভিজ্ঞতার পরিখাটুকু সাঁতরে পেরিয়ে আসতে হয়। বা, তার অভিজ্ঞতাই তাকে অভিজ্ঞতার বাইরে ঠেলে দেয়। একজন আউটসাইডার করে দেয়। সালভাদর দালি, ফ্রানৎস কাফকা বা আনে ফ্রাংক—তিনরকম পরিমণ্ডলের এই তিনজন মানুষের মধ্যে এটাই হয়তো সাধারণ মিল, একমাত্র সমন্বয়কারী সুড়ঙ্গ; তাঁদের ডায়রি পড়ে এই মনে হল।

ঋণ : দেবাশিস গুপ্ত, সৈয়দ সমিদুল আলম

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডা য় রি ▲ দেব রায়

ঘটনাটা ফিকশনারি

সাহিত্যের অনেক চরিত্রও ডায়রি লিখেছে। প্রোফেসর শঙ্কু তো আছেনই। মিছিলে রবিনসন ক্রুসো, ড্রাকুলা-র সলিসিটর জোনাথন হার্কার।

এক ।। মাইরি !

ডায়রি মানে নাকি 'ডারলিং আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ'! 'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহী' গোছের অবস্থা হলে বিরহী মানুষ হয় মেঘকে পোস্টম্যান বানিয়ে চিঠি পাঠায়, নয়তো নির্জনে ডায়রি লেখে। বাংলা ব্যান্ডের গানে আছে, ভীরু কিশোরের অধরা-প্রেমিকের উদ্দেশ্যে বলা, 'মাইরি বলছি এসব ভেবে ডায়রি লিখি খুব'। সেই গাবগুবাগুব-সংক্ষুব্ধ জীবনে ডায়রিই একমাত্র সহায়, সাহারা ভাবা হয়।

বাঙালির কৈশোর মানেই কবি-দশার সঙ্গে সঙ্গে ডায়রি-দশা অবশ্যম্ভাবী। সবার ক্ষেত্রে নয়, যারা একটু ইয়ে, মানে ভাবপ্রবণ, তাদের। আর সেইজন্য সুর-এর ডায়রি। অসুরদের ডায়রির প্রয়োজন হয় বলে শুনিনি। ডায়রি সেই নীল খামের চিঠির মতো, পোস্টকার্ডের মতো নয় যে যার খুশি পড়ে ফেলবে। বিনা অনুমতিতে অন্যের ডায়রি অতি বড় গার্জেনও ছোঁবে না। তেমনটাই দস্তুর। বয়ঃসন্ধির সেই ডায়রি মানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিবস। কারও কারও সেই অভ্যাস আজীবন থেকে যায়, দুষ্টুছেলেরা সেই অভ্যাসকে বলে 'ডায়রিয়া'। ডায়রি-লেখক বিখ্যাত হলে মরণোত্তর সেই ডায়রি প্রকাশ করে উত্তরপুরুষ বিলক্ষণ দু-পয়সা আয় করেন। বিখ্যাত না-হলে সেই পাঁজা পাঁজা ডায়রির কী দশা হয় জানা নেই। অবশ্য সব ডায়রিই যে খুব আগ্নেয়, খুব বিস্ফোরক হবে এমন নয়। কেউ খুব সাদামাটা কথা লিপিবদ্ধ করেন, 'আজ কুমড়োর তরকারিটি উপাদেয় হইয়াছিল' গোছের। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর দিনলিপিতে ইংরেজিতে তাঁর প্রাতঃকৃত্যের কথা লিখে গিয়েছেন। কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে খুঁতখুতানি ছিল তাঁর। হিসেবি লোকেরা ডায়রিতেই দৈনন্দিন হিসেব লেখেন। পুরনো দিনের তেমন ডায়রিতে 'খাসির মাংস' আড়াই টাকা কেজি পড়তে মন্দ লাগে না। আরও হিসেবি লোক হয়তো আপনাকে চা-সিঙাড়া খাইয়েই পকেট থেকে ডায়রি বের করে আপনার সামনেই লিখবে, বাজে খরচ পাঁচ টাকা। ভবদুলাল গোত্রের লোক ভাল-ভাল কথায় আর কোটেশনে ভর্তি করে ফেলবে ডায়রির পাতা। যেখান থেকে যা শুনবে, বলবে এইটি আমার চাই। এইটি আমি আমার বই-এ ঢোকাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওই নোটবই-এ যতই দুন্দুভি-অরণি থাক না কেন, ষাঁড়ে তাড়া করলেই পপাত চ মমার চ।

বাস্তবের ডায়রি-রা বহুবিধ। কখনও সাদামাটা কুষ্মাণ্ড ভক্ষণের দিনলিপি, নেহাতই 'বাহ্যিক'। কখনও তীব্র মরমি, সাদা পৃষ্ঠায় নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। কখনও তা কনফেশনাল এবং/অথবা ক্যাথারটিক। সেই সব দিনলিপির পরতে-পরতে, জড়িয়ে থাকতে পারে তীব্র অস্তিত্ববাদী সংকট অথবা নিজের যুক্তিগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সংকল্প। বাস্তবের সেই ডায়রিগুলোকে নিজেদের মতো ঘুরতে-ফিরতে দিয়ে আসুন একটু কল্পরাজ্যে উঁকি দিই।

দুই ।। হাল ভেঙে যে নাবিক।।

প্রায় তিনশো বছর আগে, সতেরোশো উনিশ সালে, প্রকাশিত হয়েছিল 'রবিনসন ক্রুসো'। ঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে অচেনা দ্বীপে ওঠা এক অদম্য নাবিকের এই গল্প দিনলিপির ঢঙে লেখা। অনেকেই 'রবিনসন ক্রুসো'-কে প্রথম ইংরেজি উপন্যাস হিসেবে মনে করেন, এবং লেখক ড্যানিয়েল ডিফো-কে ইংরেজি উপন্যাসের জনক। ডিফো যখন উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ঊনষাট। আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামের এক স্কটিশ নাবিকের জীবনের ঘটনা ডিফোকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে তিনি তাই নিয়ে একটা আস্ত উপন্যাসই লিখে ফেললেন। বাস্তবে সেলকার্ক মনুষ্যবসবাসহীন 'মাস আ টিয়েরা' দ্বীপে ১৭০৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৭০৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একা-একা কাটাতে বাধ্য হন। ডিফো'-র কাহিনির নায়ক রবিনসন সতেরো বছরেরও বেশি সময় 'আইল্যান্ড অফ ডেস্‌পেয়ার' বা নিরাশার দ্বীপ-এ জীবন কাটিয়েছে। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে ফেরার পথে সমুদ্রে ঝড় ওঠে। সঙ্গী-সাথীরা সবাই মারা যায়, একমাত্র রবিনসন গিয়ে পৌঁছয় নিরাশার দ্বীপে (১৯৬৬ সালে নামকরণ করা হয়েছে 'রবিনসন আইল্যান্ড')। সঙ্গে সম্বল বলতে জাহাজ থেকে শেষ মুহূর্তে বাঁচানো কিছু অস্ত্র, কিছু যন্ত্রপাতি ও সামান্য খাদ্যশস্য। হাল ভেঙে, দিশা হারিয়ে অরিনোকো নদীর মোহানায় সবুজ ঘাসের দ্বীপ দেখে রবিনসন ক্রুসো-র নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রেরণা আসে। ধীরে ধীরে, তার একার চেষ্টায় সেই দ্বীপে চাষবাস, পশুপালন, মাটির আর পাথরের বিভিন্ন পাত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু হয়। আদিম মানুষ থেকে সভ্য মানুষ হয়ে ওঠার যে যাত্রাপথ, তার প্রায় সবটাই রবিনসন ক্রুসোকে নতুন করে হাঁটতে হয়। সে কিন্তু হাল ছাড়ে না। নিজের তৈরি কাঠের ক্রুশে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে সে দিনক্ষণের হিসাব রাখে। নরখাদকদের হাত থেকে পালিয়ে আসা



এক বন্দিকে সে যখন অনুচর হিসেবে পায়, সেই দিনের 'বার'-এর নামে তার নাম রাখে 'ফ্রাইডে'। দীর্ঘ সতেরো বছর দ্বীপান্তর বাসের পর আবার সভ্য জগতে ফেরার সুযোগ পায় রবিনসন ক্রুসো। এই অবিশ্বাস্য কাহিনি 'আমি', 'আমি' করে, অর্থাৎ উত্তমপুরুষে লেখা। আর পুরনো ডায়রির খণ্ডাংশের সংকলন হিসেবে সাজানো। তাই মনে হয়, গল্প পড়ছি না, একজনের ডায়রি পড়ছি। গল্পটা ভীষণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসটা প্রথমে লেখকের নাম বাদ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠক তাই ধরেই নেয় যে এটি সত্যি সত্যি রবিনসন ক্রুসো নামক এক দুর্মর নাবিকের অ্যাডভেঞ্চার।

তিন ।। জোনাথন হার্কার-এর ডায়রি।।

তালুকের বিলি-বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তরুণ সলিসিটর জোনাথন হার্কার-কে পাঠানো হয়েছিল ট্রান্সিলভানিয়া-র সীমান্তে কাউন্ট ড্রাকুলার ভগ্নপ্রায় দুর্গে। এরপরের হাড় হিম-করা রোমহর্ষক কাহিনিটা বোনা হয়েছে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ডায়রির টুকরো, বিভিন্ন চিঠি আর খবরের কাগজের কাটিংয়ের মাধ্যমে। আর সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা হল বিশ্বের অন্যতম সেরা 'হরর' উপন্যাস, ব্রাম স্টোকার-এর 'ড্রাকুলা'। 'না-মর' (Un-Dead)-দের অধিপতি রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার কাউন্ট ড্রাকুলার কাহিনিটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-এর মে মাসে। এর আগে একটি এবং পরে আরও তিনটি উপন্যাস লিখলেও সাফল্যে কিংবা প্রসাদগুণে কোনওটাই 'ড্রাকুলা'-র ধারে কাছে পৌঁছয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে লন্ডনের বিশ্ববিখ্যাত লাইসিয়াম থিয়েটারের ম্যানেজার ব্রাম স্টোকার অভিনেতা স্যর হেনরি আর্ভিং-এর আদলে গড়ে তোলেন ড্রাকুলার অভিজাত ব্যক্তিত্বটি। সেই ব্যক্তিত্বের বিভায় তরুণ সলিসিটর জোনাথন হার্কার তো একেবারে সম্মোহিত। কয়েকদিন গেলে, প্রাথমিক ঘোর কাটলে পরে, জোনাথন বুঝতে পারে আদতে সে দুর্গের অতিথি মোটেই নয়, সে একজন বন্দি। কাউন্ট ড্রাকুলা-র রহস্যময় রাতচরা স্বভাবের আঁচ মিলতে থাকে আস্তে আস্তে। রাতে ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল নিষেধ,



তবু একরাতে ঘরের বাইরে বেরয় জোনাথন আর তিন রহস্যময়ী সুন্দরী ভ্যাম্পায়ারের মোহিনী-খপ্পরে পড়ে যায় আর কী! সেযাত্রা স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলা এসে জোনাথন হার্কারকে বাঁচায়। কারণ, আইনি পরামর্শ ও লন্ডনের জীবনযাত্রার হালচাল জানার জন্য জোনাথন হার্কারকে দরকার। কাউন্ট ড্রাকুলা ট্রান্সিলভানিয়া দুর্গের পাট চুকিয়ে লন্ডনের অগণিত মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে অনন্তকাল টিকে থাকার ফন্দি এঁটেছে। ড. ভ্যান হেলসিং-এর নেতৃত্বে সেই প্ল্যান ভেস্তে দিতে সামিল হবে জোনাথন হার্কার-এর সঙ্গে ড. জন সিওয়ার্ড, কুইন্সি মরিস ও আরও অনেকে। ড. সিওয়ার্ড-এর পাগলাটে রুগি রেনফিল্ড, যে কিনা পোকামাকড়, সাপ-ব্যাঙ, পাখি খায় তাদের 'জীবন শক্তি' পাওয়ার জন্য, সেও সাহায্য করবে ড্রাকুলার গতিবিধি বুঝতে। জোনাথন-এর প্রেমিকা মিনা-র বান্ধবী লুসি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবে তিন-তিনবার ভ্যাম্পায়ার তার রক্ত চুষেছে বলে। কিন্তু, মিনা ভ্যাম্পায়ার হওয়ার আগেই ড্রাকুলার দুর্গে হানা দিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে তাকে ধ্বংস করে হেলসিং-এর দল, তাই মিনা রক্ষা পেয়ে যায়। ড্রাকুলার হৃদপিণ্ড ছুরি দিয়ে বিদ্ধ করতে ঝুরঝুরে ধুলো হয়ে যায় কোন আদ্যিকালের রক্তপায়ী শয়তানের শরীর। জোনাথন আর মিনার বিয়ে হয়। তাদের প্রথম সন্তানের নাম রাখা হয় সহযোদ্ধাদের নামে।

'ড্রাকুলা'-র সাফল্যের একটা বড় কারণ, এর 'এপিস্টোলারি' স্ট্রাকচার : ওই যে ডায়রি, চিঠি, পেপারকাটিং দিয়ে কাহিনিটা বলা হয়েছে, তাতে অতি বড় গাঁজাখুরি কিংবা অলৌকিক গল্পও বড়রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়ে যায়। লেখক যেন বলেই দিচ্ছেন, ঘটনাক্রমের দায় আমার নয়, এ আমার কল্পনা নয়। আমি শুধু বিভিন্ন 'ডকুমেন্ট' পেশ করছি মাত্র। এভাবে লেখাটি একটি 'ডকুমেন্টেশন'-এর মাত্রা পেয়ে যায়।

চার।। প্রোফেসর ও মেজোকর্তা

আমাদের তো ডায়রি মানেই মনে হয় অনেক রাত অবদি টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ভুরু কুঁচকে ফেলুদা, সঙ্গে সবুজ মলাট। তার চেয়েও বেশি, গিরিডিতে উশ্রী নদীর পাড়ে প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর কথা। তারিখ বসানো পৃষ্ঠায় যেই না প্রথম লাইন শুরু হয় 'আজ সন্ডার্স'-এর চিঠি এসেছে, অমনি আমরা তৈরি হয়ে যাই এক আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার-কাম-ভ্রমণের জন্য। আপনভোলা বিজ্ঞানীটি ডায়রির পাতা ধরে পৌঁছে যান বিদেশি কোনও মধ্যযুগীয় দুর্গে, কিংবা বিজ্ঞানী সম্মেলনে। পৌঁছে যান আফ্রিকায় কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। ক্রোল আর সন্ডার্স-এর সঙ্গী হয়ে আমরাও সামিল হই কোনও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে। সেসব বিদেশ বিভুঁই-এ অস্ত্র বলতে অ্যানাইহিলিন, ওষুধ বলতে মিরাকিউরল, পোশাক বলতে কার্বোথিন।

সত্যজিৎ রায়ের যেমন বিজ্ঞানীর ডায়রি, প্রেমেন্দ্র মিত্র-র তেমনি ভূতবিশারদের ডায়রি, নাম মেজোকর্তার খেরোর খাতা। শহরের সবচেয়ে লম্বা বাস রুটের বাসে দাবিদারহীন একটা পোঁটলা পেয়েছিলেন লেখক। সেই পোঁটলাভর্তি খেরোর খাতায় মেজোকর্তার ভূতশিকারের রোমহর্ষক বিবরণ। পুরনো দিনের বনেদি বাড়ির মেজোকর্তার একটাই শখ, বেছে বেছে হানাবাড়িতে রাত কাটানো এবং সেই অভিযানের কথা খেরোর খাতায় লিখে রাখা। এর জন্য মেজোকর্তার মাইনে দেওয়া চর দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়ায় সত্যিকারের হানাবাড়ির খোঁজে। চরেদের একজনের নাম নসুরাম। সে-ই সবচেয়ে সাংঘাতিক সাংঘাতিক ভৌতিক ডেরার খোঁজ আনে। আর শনি-মঙ্গলবার অমাবস্যায় বেছে-বেছে সেই সব জায়গায় টর্চ-বিছানা-জলের কুঁজো নিয়ে রাত কাটান মেজোকর্তা। এইভাবে কত বিচিত্র ভূতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় সে-কথা লিখে রাখেন তিনি তাঁর জার্নালে। ভিতু ভূত, ভুলো ভূত, ভাল ভূত, ভক্ত ভূত, ভয়ঙ্কর ভূত। গুপ্তধন উদ্ধারের আশ্চর্য সাংকেতিক ধাঁধা। ভাগ্যিস অমন পোঁটলাটা লেখক বাসের সিটে পেয়েছিলেন।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরু হল নতুন কলাম। ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

আজকাল মাঝেমাঝেই খুব রেগে যাই। তখন রক্তচাপ বেড়ে যায়। আমার চিকিৎসক ডাক্তার তমোনাশ ভট্টাচার্য চিকিৎসার পাশাপাশি শিল্পসাহিত্যে সময় দেয়। আমাকে সতর্ক করে বলে, 'দয়া করে টেনশন করবেন না। রোজ সকালে একটা নুমলোটর ফাইভ খাবেন। সম্ভব হলে খবরের কাগজ অথবা টিভি দেখবেন না।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী করে সময় কাটাব?'

'বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়বেন। টেনশন বাড়ার মতো কিছু ওখানে লেখা হয় না।'

আমার এই রাগ হওয়াটা শুরু হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন বয়স কম ছিল, রক্তের চাপ বাড়ছে কি না টের পাইনি। কাগজে পড়লাম, ভ্যানে চাপিয়ে ময়দানে নিয়ে গিয়ে এক নকশাল বন্দিকে পুলিশ বাড়ি ফিরে যেতে বলে পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে। নিজের ঘরে বসে আঙুল মুঠো করেছিলাম। তার বেশি করার ক্ষমতা ছিল না। আবার ওই নকশালরা যখন মূর্তি ভেঙেছে, স্কুল পুড়িয়েছে তখন মাথা গরম করেছি। যে লোকগুলো ওইসব কাজ করছিল তাদের ধরে মারলে খুশি হতাম। কিন্তু তাই বলে কাপুরুষের মতো পেছন থেকে গুলি করে মারাটাকে ঘৃণা করেছি।

ছাত্রজীবনে দেখতাম যারা রাজনৈতিক দলের সমর্থক তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, বড়দাদারা যা বলেন তা-ই অনুসরণ করতে হয়। ডিসিপ্লিন না-থাকলে দল থাকবে না। তবে তাঁদের দলের হয়ে সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা। কোনও একজন ব্যক্তি নন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে মার্কস পড়েছি, লেনিন থেকে মাও সে তুং হয়ে গান্ধী, কোনওটাই বাদ দিইনি। এঁরা কেউ বলেননি তোমার ভাইকে খুন করো। তোমার ভাই যদি একটি সাধারণ গরিব মানুষ হয়েও তোমার বিপক্ষ দলের সমর্থক হয়, তা হলে তার বাড়ি জ্বালিয়ে দাও। বত্রিশ বছর ধরে সেই কাণ্ড দেখে দেখে আমি বা আমার মতো কোটি কোটি মানুষ শুধু হতাশায় মাথা নেড়ে গিয়েছি।

বয়স বাড়ল। লেখক হিসেবে পরিচিত হলাম। প্রকাশকরা বলেন কিছু পাঠক আমার লেখা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করেন। তখন মনে হল, আমি তো আর একা নই। আমার পাঠকদের কাছে এই রাগ হওয়ার কারণগুলো পৌঁছে দিতেই পারি। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন। আমরা যখন লেখালেখি শুরু করি তখন প্রথম যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা হল, যা লিখব তা যেন সাহিত্য হয়। স্লোগান বা জ্ঞানবিতরণ কখনই সাহিত্য নয়। সাহিত্যে মানুষের কথা এমনভাবে বলতে হবে যা একদিকে ফোটোগ্রাফ হবে না, আবার আরোপিত বলেও মনে হবে না। এই মানুষ ভালবাসে, সুখ এবং দুঃখ পায়, বাজারে যায়, গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে বা কিনতে গিয়ে টাকা ফুরিয়ে যায়। এই মানুষ মিছিল করে আবার মিছিলের জন্যে হাসপাতালে যেতে না-পারায় পথেই মারা যায়। এই মানুষ পাড়ায় রাজনৈতিক দলের ডাকাবুকো নেতা, আবার অফিসে গিয়ে সহকর্মীদের কাছ থেকে ঘুষের ভাগটা স্বচ্ছন্দে নিয়ে থাকেন। এদের নিয়ে লেখালেখি, এরা যে রাজনৈতিক চাপে বসবাস করে তা নিয়ে গল্প-উপন্যাস খুব কম লেখা হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। লিটল ম্যাগের কিছু লেখক এই চেষ্টাটা করেছেন কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ার সুযোগ পায়নি পাঠকরা, অথবা তাঁদের গ্রহণ করেনি তারা। আর যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের রাজনৈতিক দায়টা কলমকে এত চেপে ধরেছিল যে, লেখাগুলো সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। আমি কবিতার কথা বলছি না। মহাশ্বেতা দেবী এবং দেবেশ রায় আমার নমস্য লেখক। এঁরাই পেরেছেন।

একাত্তরের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সাহিত্য যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মূলত কবিতার ক্ষেত্রে অনেক ভাল কবিকে পেয়ে গেলাম আমরা। গল্প-উপন্যাসের লেখক-লেখিকাও কিছু কম দেখা দিলেন না। জল একটু থিতু হলে দেখা গেল জনা আটেক লেখক পাঠক পেয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের নাম হুমায়ুন আহমেদ, যাঁর বই শরৎচন্দ্রের বিক্রিকে ছাপিয়ে গিয়েছে।



আমি লক্ষ করতাম বাংলাদেশের বেশিরভাগ লেখকদের লেখায় সময় চিহ্নিত হয় না। অর্থাৎ কাহিনি কোন সময়ের তা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কাহিনির চরিত্ররা রাস্তায় কোনও মিছিলে যান না বা আটকে থাকেন না। বেশিরভাগ কাহিনিতে সরকারি দল বা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে একটি বাক্য ব্যয় করা হয় না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে এই উপন্যাসগুলো পড়লে বোঝাই যাবে না সরকারে বিএনপি না আওয়ামি লিগ ছিল। হুমায়ুন আজাদ অথবা ইলিয়াসের লেখায় ক্ষোভ আছে, বাকিরা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। গত মাসে হুমায়ুন আহমেদের বাড়িতে আড্ডা মারতে মারতে প্রশ্নটা করেছিলাম। একটু চুপ করে হুমায়ুন বলেছিলেন, 'অসুবিধে আছে। এখানকার রাজনৈতিক পরিবেশ আপনাদের মতো নয়।'

হ্যাঁ, ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখকদের স্বাধীনতা আছে যতক্ষণ না তাঁর কলমে রাষ্ট্রদ্রোহী লেখা বের হবে অথবা অশ্লীলতার পচা গন্ধ ছড়াবে। আমার 'উত্তরাধিকার' বের হওয়ার পর তখনকার প্রথম সারির বামফ্রন্ট নেতা এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কংগ্রেসের পতনের কারণগুলো কাহিনিতে ছড়ানো ছিল। আবার সেই নেতাই 'কালবেলা' বেরুবার পর আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'ছিঃ। পেছন থেকে ছুরি মারলেন।' বলেছিলেন, কিন্তু বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের শাসনকালে কলম কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাননি। অথবা তাঁরা ভেবেছিলেন একজন গল্পলেখক কী লিখছে তা নিয়ে পাঠকরা মোটেই আলোড়িত হবে না। তা ছাড়া ক'জন লেখক আর সত্যি কথা বলার সাহস দেখাবেন। কেউ যদি দেখিয়ে ফেলেন তা হলে সেটা উপেক্ষা করার কায়দা তাঁরা বছরের পর বছর থেকে রপ্ত করে ফেলেছিলেন। জনগণের একাংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদিতে নিয়মিত ব্যস্ত রেখে নিরাপদ বলয়ে থাকতে চেয়েছেন। ওই একাংশকে স্বপক্ষে রাখতে হলে পাইয়ে দেওয়ার স্রোত বজায় রাখতে হয়। প্রসঙ্গত একটা ঘটনা মনে পড়ছে। জলপাইগুড়ি শহরে আমার পিতামহ একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন। তাঁর এবং আমার পিতার মৃত্যুর পরে মা সেই বাড়িতে বাস করতেন। হঠাৎ তাঁর বাসনা হল জলপাইগুড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করবেন। ওই বাড়ি



বিক্রি করতে হল লোকাভাবে। বিক্রির কথা প্রচারিত হতেই স্থানীয় বামপন্থী কাউন্সিলর অনুরোধ করলেন পঁচিশ হাজার টাকা নতুন কালীবাড়ির তৈরির জন্যে দান করতে। উনি সবিনয়ে বললেন, 'ধরে নিন আগামী পঁচিশ বছরের চাঁদা অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছেন।' আমরা অক্ষমতা জানাতেই এলাকার কয়েকটি ছেলে, যারা বামপন্থী মিছিলে হাঁটে, এসে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইল, নইলে বিক্রি করতে দেবে না। আমি পার্টির জেলা সম্পাদককে জানাতে তিনি বললেন, 'আর বোলো না। আমি নিজের বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে ওরা আমার কাছেই টাকা চাইছে।'

আমার খুব রাগ হয়েছিল। শেষে পুলিশকর্তাদের সাহায্যে ওদের বাধা পেরিয়েছিলাম।

ইদানীং আমি চেষ্টা করি টিভির পর্দায় চোখ না রাখতে। সারাদিন খবর পরিবেশন করে এমন দু'টো চ্যানেল কী সুকৌশলে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী খবর পরিবেশন করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ জানে একটা বামন্থীদের চ্যানেল, অন্যটা বিরোধী নেত্রীর। আবার বলছি, বিরোধী নেত্রীর, তৃণমূলের নয়। এ এক আজব ব্যাপার। এটা জানার পর যে যার পছন্দমতো চ্যানেল দেখেন। এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এই কিছুদিন আগে বামপন্থীরা বন্‌ধ ডেকে বলতেন মানুষের প্রতিবাদকে সম্মান জানাতে তাঁরা বন্‌ধ ডেকেছেন। বিরোধীদের বন্‌ধ ডাকাকে তাঁরা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা বলে ঘোষণা করতেন। আবার বিরোধীরাও কম যান না। তাঁরা সব জায়গায় সিপিএমের ভূত দেখছেন। আর এর ফলে কারও ভাষায় লাগাম থাকছে না। শ্লীলতা-অশ্লীলতার কেয়ার করছেন না। বামপন্থী নেতা অনিল বসু প্রকাশ্যে বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে যে নোংরা কথা চিৎকার করে বলেছেন তা টিভি চ্যানেল সোৎসাহে শুনিয়েছে। একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা শিষ্টাচার মানা দূরের কথা, জনসভায় ওইরকম কথা বলছেন এবং তাঁর পার্টি চুপ করে বসে থাকল? রাগ হয় খুব। পার্টির কি উচিত ছিল না লোকটিকে সাসপেন্ড করে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া? আবার মধ্যরাত্রে টিভির ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে চাইলে, তৃণমূল নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও মাফিয়াদের মতো অভিব্যক্তি নিয়ে বলেন, 'এটা কি বুদ্ধবাবুর বাবার চ্যানেল?' ভাবা যায়? বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান নেতা মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন, পাগলা দাশু। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মহাকরণে যাচ্ছেন কারণ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতার চান। মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন, আপনি নিজেকে গ্রেফতার করুন। সবরকম সৌজন্যবোধ আজ উধাও হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নন্দনের সামনে বিক্ষোভ দেখালে শিল্পীদের বলেন, 'ওরা' এবং নিজের স্তাবকদের 'আমরা' বলে কাছে টেনে নেন। আবার সাংসদ কবীর সুমন দুম করে বোমা ফাটালেন এই বলে যে তাঁর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করার জন্যে সরকারি টাকা তৃণমূলের নেতারা খরচ করতে চাইছেন, তাঁকে ছুঁতে দিচ্ছেন না। এরকম হবে জানলে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতেনই না। তাঁর দলের নেত্রী—যেমন লোকে শিশুর দৌরাত্ম্য উপেক্ষা করে—তেমন গলায় বললেন, 'উনি আমাদের অতিথি।' তাঁর দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে যিনি লড়েছেন, জিতে সাংসদ হয়েছেন, তিনি কী করে অতিথি হন আমার জানা নেই। সিনেমার চরিত্রলিপিতে মাঝেমাঝে নামকরা শিল্পীর নামের পাশে অতিথি লেখা থাকে, রাজনীতি যদি চলচ্চিত্র হয় তা হলে বলার কিছু নেই। কবীর সুমন যত তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন শান্ত হয়েছেন তার চেয়ে কম সময়ে। ভাল।

এসব দেখেশুনে ঘরে বসে আছি আর রক্তচাপ বেড়েই চলেছে। গল্প-উপন্যাসের শর্ত মেনে যেসব কথা লেখা যায় না, ঋতুপর্ণ তখন ফিচার লেখার আমন্ত্রণ জানালেন তখন মনে হল, কিছু না পারি লিখে রক্তচাপ কমাই।

'খোলাখুলি' তাই একান্তই আমার ভাবনা। এই আমি কয়েক কোটি বাঙালির একজন।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোল্লাছুট তসলিমা নাসরিন

শুরু হল নতুন কলাম। প্রবাসী লেখিকার নিয়মিত দিনলিপি



'পশ্চিমের নারীবাদ' কেন, 'প্রাচ্যের নারীবাদ' সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা ছিল না। ওসব না জেনেও শিশুবয়স থেকেই পরিবারের এবং সমাজের অনেক আদেশ-উপদেশ, অনেক বাধা-নিষেধকে আমি প্রশ্ন করেছি। আমাকে যখন বাইরের মাঠে খেলতে দেওয়া হত না, কিন্তু আমার ভাইদের দেওয়া হত, ঋতুস্রাবের সময় আমাকে যখন 'অপবিত্র' বলা হত, আমাকে যখন বলা হত আমি এখন বড় হয়েছি, যেন কালো বোরখায় আপাতমস্তক ঢেকে বাইরে বেরোই, আমি প্রশ্ন করেছি, আমি মানিনি। রাস্তায় হাঁটিলে আমাকে যখন গালি ছুড়ে দিত অচেনা ছেলেরা, যখন ওড়না কেড়ে নিত, স্তন টিপে ধরত, প্রতিবাদ করেছি। ঘরে ঘরে যখন দেখেছি স্বামীরা বউ পেটাচ্ছে, কন্যা-শিশু জন্ম দিয়ে মেয়েরা আশঙ্কায় কাঁদছে, আমি সইতে পারিনি। ধর্ষিতা মেয়েদের লজ্জিত মুখ দেখে বেদনায় নীল হয়েছি। পতিতা বানানোর জন্য এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে মেয়েদের পাচার করার খবর শুনে কেঁদেছি। শুধু দু'টো ভাত জোটাতে পতিতাপল্লিতে মেয়েরা চরম যৌন-নির্যাতন সইতে বাধ্য হচ্ছে, পুরুষেরা চার-চারটে মেয়েকে বিয়ে করে ঘরের দাসী বানাচ্ছে, উত্তরাধিকার থেকে শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে বঞ্চিত হচ্ছে, পারিনি মেনে নিতে। যখন দেখতাম ঘর থেকে দু-পা বেরলে মেয়েদের একঘরে করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, 'পরপুরুষ'কে ভালবাসার অপরাধে তাদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, উঠোনে গর্ত করে সেই গর্তে ঢুকিয়ে মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হচ্ছে, আমি চিৎকার করতাম। কোনও যুক্তি দিয়ে কোনও বুদ্ধি দিয়ে মেয়েদের ওপর পুরুষের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ওসব অত্যাচার মেনে নিতে পারিনি। আমার সেই বেদনা, সেই কান্না, সেই অস্বীকার, সেই মেনে-না-নেওয়া, সেই বাকরুদ্ধ হওয়া, সেই না-সওয়া, সেই যুক্তি-তর্ক, সেই চিৎকার কেউ দেখেনি। দেখল, যখন থেকে লিখতে শুরু করলাম।

আমি যে সমাজে বড় হয়েছি, সেই সমাজে অনেকের মনেই প্রশ্নের উদয় হত। তারা মেনে নিতে বাধ্য হত পুরুষতন্ত্রের কর্তাদের উত্তর। আমি বাধ্য হইনি। আমাকে কেউ অবাধ্য হতে শেখায়নি। কোনও বই পড়ে আমি অবাধ্য হওয়ার শিক্ষা অর্জন করিনি। সচেতন হওয়ার জন্য বড় বড় বই পড়তে হয় না। দেখার চোখ থাকলেই অনেক কিছু দেখা যায়। বুকের পাটাটাও কেউ গড়ে দিয়ে যায় না। গ্রামের মেয়েরা যখন জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, জমি কেড়ে নিতে চাইলে 'দেব না' বলে রুখে দাঁড়ায়, সেই মেয়েরা কোনও কার্ল মার্কস বা লেনিনের বই পড়ে ওই প্রতিবাদটা শেখে না। জীবনই তাকে জীবনের প্রয়োজনে বলে দেয় কী করতে হবে বা হবে না। বুদ্ধির মুক্তি কারও হয়, কারও হয় না। বড় বড় দর্শনের বই পড়েও মানুষ অশিক্ষিত থেকে যায়, কোনও বই না পড়েও অনেকের বোধবুদ্ধি জন্ম নেয়। নারীর অধিকারের দাবি করতে গেলে বেটি ফ্রিডান বা রবিন মরগ্যান পড়তে হয় না। নিজের চেতনই যথেষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজের অধিকারের বিষয়ে যাদের সচেতনতা এসেছে, তাদের একের সঙ্গে অপরের জানাশোনা হওয়ার কোনও দরকার হয়নি। মুক্তবুদ্ধির মানুষের চিন্তাধারা এবং ভাবার মধ্যে মিল থাকেই। পুবের নারীরা যখনই বন্ধ ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে তখনই পুবের পুরুষবাদীরা তাদের দোষ দিয়েছে যে, তারা পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের অনুকরণ করছে। আমার খিদে পেলে আমি খাব, আমাকে চাবুক মারলে আমি চাবুক কেড়ে নেব, আমাকে পিষতে চাইলে আমি উঠে দাঁড়াব—এটা চিরকালীন। নারীবাদ পাশ্চাত্যের সম্পত্তি নয়। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত, অসম্মানিত, অবহেলিত নারীদের একজোট হয়ে নারীর অধিকারের জন্য জীবন বাজি রেখে কঠিন সংগ্রাম করার নাম নারীবাদ।

পশ্চিমের মেয়েদের জীবন জানতে গিয়ে দেখেছি ওরাও কম দুর্ভোগ পোহায়নি। অত্যাচারিত হতে হতে, রক্তাক্ত হতে হতে ওদেরও দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। একসময় চিৎকার করেছে। পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্ম, নারী-বিরোধী সংস্কার ইত্যাদির শিকার হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভুগেছে পুবের মেয়েদের মতো পশ্চিমের মেয়েরাও। ধর্মান্ধরা তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে, নারী-বিরোধী সংস্কার তাদের শরীরে সতীত্বের লোহার খাঁচা পরিয়ে দিয়েছে, তাদের যৌনদাসী করে রেখেছে, ক্রীতদাসী করেছে। মেয়ে হওয়ার অপরাধে মেয়েরা একইরকম ভোগে পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে। পশ্চিমের মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল, যুগের পর যুগ সে আন্দোলন তাদের চালিয়ে যেতে হয়েছে। ভোটাধিকারের আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের অপমানিত হতে হয়েছে। পুরুষেরা তাদের দিকে থুতু ছুড়েছে, গালি দিয়েছে। তবু তারা বারবার একই কথা বলে গিয়েছে, 'বৈষম্য যে করেই হোক ঘোচাতে চাই, সমানাধিকার যে করেই হোক চাই।' শতাব্দী জুড়ে আন্দোলনের ফলে তারা আজ যেটুকু অধিকার অর্জন করেছে, তা সম্পূর্ণ নয়। গর্ভপাতের অধিকারের জন্য মেয়েরা আজও লড়ছে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আজও তারা প্রতিবাদ করছে, শ্রমিকের সমান বেতনের দাবিতে আজও মিছিলে নামছে, সংসদে নারী-সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আজও আন্দোলন করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আজও নির্যাতিত মেয়েদের ভিড়। হ্যাঁ পাশ্চাত্যের সাদা মেয়ে, সোনালি চুলের মেয়ে। এখনও প্রতারিত হয়ে, এখনও অভাবে অত্যাচারে তাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয় শরীর বিক্রি করতে। আশির দশকে নারীবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সাফল্য এসেছে পশ্চিমে। নারীবাদকে নেতিবাচক সংজ্ঞায় পুরে প্রায় আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। আইনে সমানাধিকার জুটলেও পুরুষতান্ত্রিকতা এবং ধর্মান্ধতা নিরলস ফণা উঁচিয়ে থাকে, সুযোগ পেলেই ছোবল দেয়। নারীবিরোধী-মানসিকতা পশ্চিমের অধিকাংশ পুরুষের মস্তিষ্কের বড় অংশ জুড়ে এখনও ঘাপটি মেরে থাকে।

নারী নির্যাতনের কোনও দেশভেদ নেই। সমানাধিকারের বা মানবাধিকারের কোনও পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হয় না। মেয়েরা সব দেশেই সব কালেই নির্যাতিত। মানবাধিকার ইউনিভার্সাল। বিশ্বজনীন। প্রাচ্যের জন্য আলাদা মানবাধিকারের কথা বলে 'বিশ্বজনীন মানবাধিকার' থেকে যারা আলাদা হতে চায় এবং মনে করে এই করেই বুঝি পাশ্চাত্যের এতকালের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ভারি একটা যুদ্ধ করা গেল, তারা পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি করে। পাশ্চাত্যের বিদেশনীতি প্রাচ্যকে শোষণ করেছে। সবল মাত্রই দুর্বলের ওপর যে শোষণ করে, সেই শোষণই করেছে। প্রাচ্যের ক্ষমতাসীনরাও প্রাচ্যের সাধারণ মানুষকেও শোষণ করে চলেছে, ওই একই কায়দায়। পাশ্চাত্যের ক্ষমতাসীন, বর্ণবাদী, উন্নাসিক মানুষ এবং পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষকে এক করে দেখার কোনও কারণ নেই। পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ মানুষ, সে প্রাচ্যে হোক, পাশ্চাত্যে হোক, অত্যাচারী দ্বারা কোনও না কোনওভাবে অত্যাচারিত। যুদ্ধটা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। যুদ্ধটা সর্বকালেই সর্বদেশেই ক্ষমতাবানের সঙ্গে ক্ষমতাহীনের, যুদ্ধটা বৈষম্যের সঙ্গে

সমানাধিকারের। বিরোধ বর্বরতার সঙ্গে বোধের, অন্ধের সঙ্গে আলোকিতের, অজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞানের, অযুক্তির সঙ্গে যুক্তির, পরাধীনতার সঙ্গে স্বাধীনতার, অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের, অমানবিকতার সঙ্গে মানবিকতার, রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতির, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের। এই যুদ্ধ দেশকালবর্ণলিঙ্গশ্রেণি নির্বিশেষে সর্বত্র চলেছে, আজও চলছে।

ধর্মীয় স্পর্শকাতরতায় আঘাত দিয়েছি আমি, এমন প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে। ধর্মের সঙ্গে নারীবাদের বিরোধ চিরকালের, নারীর অধিকার সম্পর্কে অতি সামান্য জ্ঞান যার আছে, সে-ই এটা জানে। ধর্ম আগাগোড়াই পুরুষতান্ত্রিক। আমি ধর্মও মানব, নারীর অধিকারও মানব, এ অনেকটা আমি বিষও খাব, মধুও পান করব, বলার মতো। যখনই নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারীর ওপর ধর্মীয় নির্যাতনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তখনই ধর্মীয় স্পর্শকাতরতাকে আঘাত দেওয়া চলবে না এই স্লোগান তুলে গণতন্ত্র বিরোধী, বাক-স্বাধীনতা বিরোধী, নারী-স্বাধীনতা বিরোধীরা সরব হয়ে উঠেছে দেশে দেশে। ধর্মের বর্ম ব্যবহার করে পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র খুব পুরনো। কোনও 'সংস্কৃতি' যদি নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করে রাখে, সেই সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা; সে সংস্কৃতি হিন্দুর হোক, মুসলিমের হোক, খ্রিস্টানের হোক, ইহুদির হোক—কোনও সুস্থ, সভ্য, প্রগতিশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কোনও বর্বরতাকে সংস্কৃতি বলি না। বর্বরতার বিরুদ্ধে চিরকাল সব সংস্কৃতির মানুষই প্রতিবাদ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর রামমোহন রায়কেও হিন্দুর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে হয়েছিল।

মুসলিমের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতায় আঘাত লেগেছে বলে কিছু কূপমণ্ডুক এক বাক্যে রায় দিয়ে দেন যে আমার বয়ান পাশ্চাত্যের বয়ান, পশ্চিমের চোখে প্রাচ্যকে দেখার বয়ান। সহিষ্ণুতার নামে মুসলিম মৌলবাদীদের এই অর্থহীন-যুক্তিহীন দাবিটি তথাকথিত ভারতীয় সংজ্ঞার 'সেকুলার' নামধারীরা প্রায়শ উচ্চারণ করেন। পাশ্চাত্য 'মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী' হলে লক্ষ লক্ষ মুসলিম পাশ্চাত্যে বাস করতে পারত না, নিরাপদে নিশ্চিন্তে তাদের ধর্মচর্চা করে যেতে পারত না, এলাকায় এলাকায় মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে তুলতে পারত না। ইরাকের যুদ্ধের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানববাদীর মিছিল হত না। আজ ব্রিটেনে মুসলিমরা তাদের নারী-বিরোধী শরিয়ত-আইন, যে আইনে পুরুষের বহুবিবাহ, পুরুষের নারী নির্যাতন, নারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা আইনসিদ্ধ হবে—সেটি আনার দাবি তুলছে, এতে সায় দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের বিশপ সহ বেশ ক'জন ব্রিটিশ মন্ত্রী। মুসলিমদের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে এঁরা কি মুসলিমদের সত্যিকার কোনও উপকার করবেন? যারা আজ সমানাধিকারের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে মুসলিমদের বৈষম্যের সংস্কৃতি লালন করার পক্ষে, তারা মুসলিমদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়, তারাই মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। খ্রিস্টান সমাজে ধর্মীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে আইন তৈরি হয়েছে, হিন্দু সমাজে হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে ধর্মান্ধতার অন্ধকার বিরাজ করুক, সংস্কৃতির নামে বর্বরতা চলুক, নারী পুরুষের চরম বৈষম্য টিকে থাকুক, তাকে বাহবা দিয়ে যাব, প্রগতির পথে মুসলিমদের চলতে দেব না, তাদের আলোকিত হতে দেব না—এই মানসিকতার মানুষ মুসলিম সমাজের কত বড় যে ক্ষতির কারণ, তা মুসলিমরা আজ না বুঝলেও নিশ্চয়ই একদিন বুঝবে। মুসলিম সমাজের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যে মেয়েরা আজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নির্বাসনের হুমকি নিয়ে নারীর অধিকারের কথা বলছে—সেই মেয়েদের সেই কথাকে 'পাশ্চাত্যের বয়ান' বলে যারা হেয় করে, তাদের আধুনিকতাকে আমি ধিক্কার দিই।

খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদি ধর্ম এবং অন্য আরও নারী-বিরোধী ধর্মের নিন্দা আমি করেছি, কিন্তু তারপরও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ করে না কেউ। অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলে কেউ আমাকে হত্যা করার ফতোয়া দেয় না। যারা ফতোয়া দেয় তাদের অসহিষ্ণুতাকে মেনে নিতে, তাদের 'ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা'কে সম্মান দেখাতে লোকের কোনও অসুবিধে হয় না এবং নির্দ্বিধায় আমাকে 'অসহিষ্ণু' বলতে তাদের বাধে না। সম্ভবত তাঁরা আমাকে 'মুসলিম' হিসেবে দেখছেন, মুসলিম হয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আমার আঘাত হানাকে স্পর্ধা বলে বিবেচনা করছেন। কবিতা সিংহ নারীবাদের কথা লিখলে বা জার্মেন গ্রিয়ার লিখলে ঠিক আছে, তসলিমা লিখলে ঠিক নেই। কারণ 'তসলিমা মুসলিম'। মুসলিম মেয়েদের একটু রয়েসয়ে চলতে হয়, মুখটা অন্য ধর্মগোষ্ঠীর মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি বুজে থাকলে মানায়।

কিন্তু সত্য কথা হল, নারীর অধিকারে বিশ্বাস করলে ধর্মপরিচয় থেকে প্রথমেই নিজেকে মুক্ত করতে হয়। কৈশোরের শুরুতেই ও থেকে আমি মুক্ত। যখন শিশু ছিলাম, শিশুদের গায়ে যেমন অন্যায়ভাবে ধর্ম-পরিচয় এঁটে দেওয়া হয়, তেমনই আমার গায়েও এঁটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, একটি শিশুকে তার বাবা-মার ধর্মবিশ্বাস দিয়ে চিহ্নিত করা নিশ্চিতই শিশু-নিগ্রহ। একটি শিশুকে তো আমরা তার বাবা-মা'র রাজনৈতিক বিশ্বাস দিয়ে চিহ্নিত করি না। আমরা কোনও কমিউনিস্টের বাচ্চাকে কমিউনিস্ট বলি না। কিন্তু দু'বছরের একটি বাচ্চাকে দিব্যি হিন্দু, বা মুসলিম বা খ্রিস্টান বলে রায় দিয়ে দিতে আমরা দ্বিতীয়বার চিন্তা করি না। শিশু বড় হওয়ার পর বাবা-মা'র ধর্ম, বা অন্য কোনও ধর্ম, বা কোনও ধর্ম নয়, পছন্দমতো কিছু একটা গ্রহণ করবে। তা-ই তো হওয়া উচিত। আমার জীবনে আমি তা ঘটিয়েছি। আমি মানববাদ বা মানবতন্ত্র বেছে নিয়েছি বিশ্বাসের জন্য। আমাকে 'মুসলিম রিফর্মার' ভেবে ভুল করা উচিত নয়। আমি রিফর্মার নই, কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীরও কেউ নই। আমার গোষ্ঠী ধর্মমুক্ত মানববাদীর।



ছবি : তসলিমা নাসরিন

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

অনুধ্যান

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক দেশ-এ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৯৯-এর মে পর্যন্ত। তারপর বছর কেটে গিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রথম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হল এ উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয়। একই ঘটনা অনেকের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এসেছে। এবং সময়ানুক্রমে মানেনি। সবচেয়ে ভাল হয় প্রথম খণ্ডটি পড়ে নিলে। তা হলে উপন্যাসটির জটিল চলন চেনা হয়ে যাবে, চরিত্রগুলোকেও ঠিকঠাক পাঠ করা যাবে। পাঠকের কাছে কি লেখক এমন দাবি করতে পারেন? জানি না।

যতদূর সম্ভব প্রথম খণ্ডের একটি চুম্বক দেওয়ার চেষ্টা করছি। পাঠক মনে রাখবেন অন্তর্জগৎ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষত বাড়ন্ত বালক-বালিকাদের পারস্পরিক ও কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা, তার ফলাফল কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে, সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে, বিশেষত ছোটদের দৃষ্টিতে তারই অনুবেদন।

সময়কাল প্রথম খণ্ডে ছিল ১৯৪৩-৫০/৫২। কিন্তু বিয়াল্লিশের আন্দোলনের আগে বিংশ শতকের প্রথম দিকেও দেশ ও সমাজ কী ছিল তা স্মৃতি, অতীতচারণ ইত্যাদির মাধ্যমে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে ছিল বিংশর স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর সামান্য ছোঁয়া, তেতাল্লিশের মহা-মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ, ৪৬-৫০/৫২ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, অসহ দারিদ্র, দুর্দশা যা দেশভাগের অবিমৃষ্যকারিতা ও বিষম আচরণের ফলে বাঙালি জাতিকে অসহায় কোণঠাসা করে ফেলে। কিন্তু আবারও বলছি রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এমনকী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি আদৌ। শিশুচিত্তে এই জটিল সময়, সম্পর্ক, সামাজিক বিধি-বিধান কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে তারই রহস্য

কেন্দ্রীয় পরিবার

উত্তর কলকাতা সংলগ্ন শ্যামপুকুর অঞ্চলের সিংহ পরিবার

ঠাকুর্দা শিবপ্রসাদ (অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার) — ঠাকুমা মনোমোহিনী দেবী (দ্বিতীয় পত্নী, নিঃসন্তান)

পিসিমা মনোরমা মিত্র (বালবিধবা নিঃসন্তান)

বাবা দুর্গাপ্রসাদ (বিপ্লবী ও হোমিওপ্যাথ)-মা দেবহূতি

ইন্দ্র	ঋদ্ধি	সূর্য	ভক্তি	শ্রদ্ধা	অংশু	ঋতি	তেমজ—বিদ্যা	পাবন	বরুণ
(ই-দাদা)	(পমপম)	(সু-দাদা)	(টমটম)	(বুজবুজ)	(অং দাদা)	(পুটপুট)	(বুবু)	(পুনপুন)	(বুনবুন)

এবং পুলক বা পালক—দুর্গাপ্রসাদের মাসতুতো দাদার ছেলে, ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পে অনাথ, তাঁর কাছেই প্রতিপালিত, ইন্দ্রর বয়সি ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

২। মামার বাড়ি, রামরতন বোস লেনের ঘোষ পরিবার—আদি বাড়ি জমিজমা—হরিপাল, হুগলি

দাদাভাই অনাদিপ্রকাশ (সরকারি চাকুরে, সংস্কৃতে পণ্ডিত, আত্মভোলা) — দিদিভাই তরুবালা (বাস্তববোধসম্পন্ন ও বুদ্ধিমতী)

মা দেবহূতি — বড়মামা ভানু (সামান্য ছিটগ্রস্ত) — কানু (কানুমামুফুল)



সেখানে নিবেদিত। নীচে দু'টি প্রয়োজনীয় বংশলতিকা দেওয়া হল।

বরুণ মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। তার প্রধান সঙ্গী তার থেকে পাঁচ থেকে ছয় বছরের বড় কানুমামুফুল।

পাবন (পুনপুন) ও বিদ্যা (বুবু) সারা পৃথিবীটাকে, তাদের আশপাশের জগৎটাকে আশ্চর্য, অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে করে। তাদের দাদা-দিদিরা, মা-বাবা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সবাই তাদের কাছে অত্যাশ্চর্য মানুষ। ইন্দ্র ঋদ্ধি ভক্তি ছোটদের শাসন-পালনের মধ্যে রেখেছে। সূর্য-অংশু জুটি নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা করে, সূর্য আবার অ্যালপাইন ক্লাসে ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল খেলে। এদের কাছে বাচ্চারা একটু বেশি প্রশ্রয় পায়।

শ্রদ্ধা—দলছাড়া, চঞ্চল, সাজগোজপ্রিয়, গান গায় খুব ভাল।

ঋতি—তেমজদের থেকে মোটে পাঁচ বছরের বড়। অংশুর সঙ্গে বেশি ভাব।

বিদ্যা-পাবন-বরুণ—অবিচ্ছেদ্য। এরাই উপন্যাসের মূল চরিত্র।

তিনজনের মধ্যে বিদ্যার স্বাস্থ্য সবচেয়ে ভাল ছিল। দুরারোগ্য ম্যানিন্‌জাইটিস রোগে মৃত্যুর মুখ থেকে সে ফিরে আসে বাবার চিকিৎসায়, শ্রীহীন ও গতবুদ্ধি হয়ে। ধীরে ধীরে উন্নতি হয়, সব নতুন করে শেখে।

পাকুমা—ইনি অতি বিত্তবান সিংবাড়ির কর্ত্রী। এঁরা রায়চৌধুরী। দেউড়িতে সিংহ থাকায় নাম সিং-বাড়ি। তাঁর নাতিপুতি সকলেই তাঁকে পাকুমা (ঠাকুমা) ডাকে। তাঁদের প্রাসাদোপম তিনমহলা বাড়িতে পুনপুনের যাতায়াত। ও বাড়ির এক বালক মানিক তার খুব বন্ধু। পাকুমা মানিকের বাবার ঠাকুমা, অতি বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী এক বৃদ্ধা যিনি বিষয়সম্পত্তি, সন্তানদের পারিবারিক জটিলতা সব কিছুর সমন্বয়সাধন করেন। এঁদের পরিবারের অতীতের মধ্য দিয়েই বিশ শতকের গোড়ার দিনগুলো ছোঁয়া হয়েছে। বিশেষ করে সে সময়ের গভীর রোম্যান্টিকতা।

পাকুমার বড় ছেলে ব্যারিস্টার ও কবি, তাঁর জার্মান ইহুদি স্ত্রী লীলাময়ী উভয়েই মারা গিয়েছিলেন আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয়জন



ছিলেন পুলিশের বড় কর্তা কিন্তু গুপ্ত-বিপ্লবী, তিনিও মৃত। এঁর স্ত্রী ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁকে জীবিত দেখেছে পুনপুন।

তৃতীয়জন—শিবশম্ভু—ছোট ঠাকুর্দা ইনি অবিবাহিত, অত্যন্ত প্রতিভাবান অভিনেতা, কিন্তু মা-বাবার আপত্তিতে অভিনয়-বৃত্তি নিতে পারেননি। ইনি একজন নষ্ট প্রতিভা। এঁরা তিন ভাই-ই লীলাময়ীকে ভালবাসতেন বলে পারিবারিক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সেই ধ্বসের স্মৃতি জীবিতরা সকলেই বইছেন, বিশেষ করে শিবশম্ভু। চতুর্থজন—পাকুমার মেয়ে উমা, সবাই ডাকে—কর্তা মা। ইনি বিধবা, মায়ের কাছেই থাকেন। এঁর বড় ছেলে রাঙা জেঠু মদ্যপ, ছোট ছেলে নতুন কাকু—দুশ্চরিত্র, জিনা নামে এক ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ইনি একজন চাইল্ড অ্যাবিউজার-ও বটে। পুনপুনের সেই নিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আছে।



পাকুমা পুনপুন আর মানিককে সান্ত্বনা দেন যে তারা খুব ভাল মানুষ হলে একদিন না একদিন ঠিক পরশপাথর পাবে।

পুলক—প্রথম খণ্ডে শ্রদ্ধাকে (বুজবুজ) বিয়ে করে পুলক সিংহবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। পুলক লেখাপড়ায় ভাল ছিল না, কিন্তু খুব ভাল আঁকতে পারত। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে। কেউ জানে না তারা কোথায়।

জ্যাঠামশাই মণিমোহন—ইনি দুর্গাপ্রসাদের তুতোভাই। বর্মার উদ্বাস্তু। প্রচুর টাকাপয়সা নিয়ে সিংহবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইনি কৃপণ, নিন্দুক, অকৃতজ্ঞ, তার ওপরে আবার ইনিও চাইল্ড অ্যাবিউজার, সে নিয়ে বুবুর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়। তারপর সব জানাজানি হলে ইনি বিতাড়িত হন।

রানি মাসিমা ও হারান—এঁরা পূর্ববঙ্গের অতি হতভাগ্য উদ্বাস্তু। মহিলা তুমুল অত্যাচারিত, স্বামীর খোঁজ জানেন না, এখানেও অনেকে তাঁকে ব্যবহার করেছে। ছেলেকে নিয়ে অবশেষে ইনি বুনবুনের জেদে দিদিভাইয়ের কাছে আশ্রয় পান। হারান লেখাপড়াকে ভয় পায়। বুনবুন আর কানু লেখাপড়ার নামে তার ওপর খুবই দৌরাত্ম্য করে। হারান টিকটিকি মাকড়সা অবলীলায় মারে, পায়রা ধরে, কিন্তু ভুগোল-অঙ্কের নামে সে কেঁচো। মণিমোহন একদিন তাঁর সংসার দেখার নাম করে, হারানকে মানুষ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এঁদের দিদিভাইয়ের আশ্রয় থেকে নিয়ে যান।

কালো মিনু—শেয়ালদা স্টেশনে দুর্গাপ্রসাদ দুর্গতদের চিকিৎসা করতে যান। এই তাঁর দেশসেবা। একদিন বুনবুন তাঁর সঙ্গ নেয়। মিনু বলে একটি মেয়ের মা টাইফয়েডে মারা যান। পরদিন গিয়ে মিনুকে আর পায় না বুনবুন। বুকের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে থাকে কালো মিনু।

ফর্সা মিনু—নিজেদের বাড়ির কাছেই বুবু এই উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েটিকে আবিষ্কার করে। বন্ধুত্ব পাতায়। এই মিনু, তার বাবা-মা সকলেই অদ্ভুত ফরসা।

এ বাড়ির আরেকটি দুশ্চরিত্র ছেলের যৌনরোগ আছে। এঁর সন্তানরা ন'-দশ বছরের হয়, আস্তে আস্তে বীভৎস আকৃতি নেয়, তারপর মারা যায়। ইনি এখন শয্যাশায়ী। কেউ জানে না এঁর রোগ কী! জানা গেল, পুনপুনের বাবা দুর্গাপ্রসাদের দৌলতে, তখন আর আশা নেই। কিন্তু এঁর সদ্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী দুর্গাপ্রসাদের চিকিৎসায় একটি স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম দেন। তাঁদের শেষ মৃতকন্যার নাম ছবিরাণী। সে মানিক ও পুনপুনদের বন্ধু ছিল।

এঁদের বিশাল বাড়ির অনেকটাই পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের দ্বারা জবরদখল হয়ে যায়। এই পরিবারেই পুনপুনের জীবনের অনেক দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা।

পাকুমা গল্পচ্ছলে তাঁর পূর্বজীবনের কথা যা বলেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি পূর্ববঙ্গের এক বানভাসি মেয়ে। বানে তাঁর মা-বাবা, দুই ভাই সরল ও সুন্দর (রূপক?) সবাই ভেবে যায়। তিনি নাকি এক পদ্মগোখরোকে বানের সময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে তাঁকে এক পরশপাথর দিয়ে যায়। এ পাথর লোহাকে সোনা করে না, চারপাশে কল্যাণ ও শান্তি আনে। পরিবারের অধঃপতনে ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন। প্রায়োপবেশনকালে ইনি নাতি-নাতবউ-মেয়ে এদের ভুল যতদূর সংশোধন করে দিতে শেষ চেষ্টা করে যান, বলেন তাঁর পরশপাথরটি হারিয়ে গিয়েছে, খুঁজে দিতে পারলে তিনি না হয় আর প্রাণত্যাগ করবেন না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বভাবতই তা পাওয়া যায় না। কেউই বুঝতে পারে না এ এক প্রতীকী চাওয়া।

দ্বিতীয় খণ্ড কিন্তু এরপরের সময়ভাগ থেকেই শুরু হচ্ছে না। এখানেও প্রথমখণ্ডের সময় উঠে এসেছে। অতীতচারণা ও বর্তমান-চারণায় তেমন কোনও তফাত নেই। কেন না তিনি মূল চরিত্রের চেতনায় তেমন কোনও সময়ভাগ নেই। অনুষঙ্গে কখন কী প্রসঙ্গ আসবে, কেউ বলতে পারে না। এখন দেখা যাক কী হয়।

ছবি : ঈলীনা বণিক

গেলাসে নাম লেখা থাকত, মনে আছে। কাঁসার গেলাসে। আগে আগে প্রায় বাড়িতেই কাঁসার বা পেতলের গেলাস ব্যবহার হত। কারও বাড়ির উঠোনে বা ছাদে দৌড়ঝাঁপ করছি। তেষ্টা পেল তো দালানে গিয়ে বললাম, মাসিমা, জল খাব। কাঁসার গেলাসে জল এল, কখনও দু'টো বাতাসা। আমি বাতাসা পেলাম দেখে অন্য ছেলেপুলে দৌড়ে এল। তারাও জল খাবে। সেইসব গেলাসে নাম লেখা—সরলা, ছবি, শিবানী,রবিন, কানু—এইসব। ভিলাইতে আমাদের দিদি থাকে, গেলাম। দু'টো গেলাস কিনে দিয়ে তার গায়ে দু'ভাইয়ের নাম লিখিয়ে দিল। গেলাসে জল খাব কী! ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেই চলেছি।

এসব পুরনো কথা মনে এল ছোট্ট একটা কবিতা পড়ে :

কাঁসার গেলাস
কাঁসার গেলাসে লিখে রেখেছিলে নাম
পুরনো ধাতুর দাম
সে গেলাস কবে একেবারে
বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে।
আজকাল কারা পান করে,
তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?

কবিতাটি তারাপদ রায়ের। আমার বাল্যস্মৃতির কথা যতটুকু বললাম, এ কবিতায় অবশ্যই তার বেশি কিছু আছে। অনেক বেশি কিছু। কিটস-এর 'ওড' আছে গ্রিসিয়ান আর্ন-কে নিয়ে, 'ওড' না হলেও, এ-ও তেমনই বাঙালির গৃহস্থ-জীবনের স্মৃতিকে নিয়ে কবিতা-কণিকা। গেরস্তের ঘরে কাঁসার বাসন যেমন থাকত তেমনই অভাবও থাকত। এখনও অভাব আছে অনেক বাড়িতে, তবু কাঁসার বাসন তত নেই। আগে আগে একটা কথা বলা হত, পুরনো হয়ে যাওয়া লোকেরা বলতও, অমুক এমন অভাবে পড়েছে যে ঘটিবাটি বিক্রি করে খেতে হচ্ছে। অভাবে না পড়লেও ঘটিবাটি বিক্রি হত না তা নয়। দুপুরে ফেরিওয়ালা যেত ডাকতে ডাকতে। পুরনো বাসন নিতে চায় তারা, বা পুরনো শাড়ি। বদলে নতুন বাসন। মাসিমা, কাকিমারা পুরনো বাসন বিক্রি করে দিতেন। হয়তো একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে দু-তিন বছর। তার বউদি তখন সেই সংসারের কর্ত্রী। ফেরিওয়ালা হাঁকছে, বা-স-ন ব-দ-লা-বে-এ-এ। 'মাধু' লেখা কাঁসার গেলাস পাল্টে দু'টো স্টিলের বাসন নিয়ে নিল। 'মাধু' গেল একজনের ঘরে। সেই একজন না-হয় তার বর। আর 'মাধু' লেখা গেলাস চলে গেল কোন সুদূর অপরিচিতের বাড়ি। 'তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?' এই লাইনটি নিশ্চিতভাবেই লেখাটিকে প্রেমের কবিতা করে তুলতে চায়। 'তোমার নামের জল' কথাটিতে 'প্রেম-শান্তি' বলা আছে। 'জল'-এ সেই শান্তিচিহ্ন। বিরহবোধ, কিন্তু, পুড়িয়ে দেওয়া বিরহ নয়। 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল' হয়তো সেই মেয়ে—যার নাম কাঁসার গেলাসে লেখা ছিল। অন্যদিকে, এই সমস্তটাই আবার একটি দুঃখিত ভর্ৎসনার স্বরও রেখে যেতে পারে। যদি 'বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে' লাইনটির দিকে তাকাই। কোনও মানুষ, সে হয়তো আমার প্রিয় বা কাছের, আজ নেই, ছিল একদিন। কিন্তু, তার যে-সব মূল্যবোধ, যে-সমস্ত গুণলক্ষণ তাকে আমার কাছে অনন্য বা অনন্যা করেছিল—তার সবই সে পাল্টে নিয়েছে, বা বিসর্জন দিয়েছে। এই যে 'একেবারে/বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে', এই 'একেবারে' কথাটায় দুঃখিত সেই ভর্ৎসনার টান আছে। আবার এটাও হতে পারে, নিজের যে-সব মূল্যবোধ একদিন যত্ন করে খোদাই করেছিলাম জীবনে, সেগুলোকে দায়ে পড়ে, বাজারের টানে, গৃহস্থ যেমন অভাবের দায়ে বিক্রি করে, সেইভাবে, নিজ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পুরনো ধাতুর দামে ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে দিয়ে দিয়েছি, অল্প দামে, অন্যদের কাছে, বাজারের হাতে। সেক্ষেত্রে, কবিতাটির শেষ লাইনের 'তুমি' আসলে বা 'আমি' নিজেই। পাশাপাশি এই শেষ নিজের প্রতি না-বলে, আমি বলতে পারি কোনও নিকটজন বা বন্ধুকে। বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই।

এতগুলো কথা বলছি এই জন্য যে, কবিতাটি পড়ে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে আনতে পারে।

কবিতাটি লেখক কী অর্থ প্রকাশ করতে লিখেছিলেন তা আমি জানি না, সত্যি বলতে জানতে চাই-ও না। কারণ কোনও কবিতা পড়ে আমি লেখাটিকে ঠেলতে ঠেলতে পিছু হঠাতে হঠাতে, লেখকের জীবনের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিতে চাই না। কবিতাটি তার জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আমার দিকে এল। আমার জীবন-অভিজ্ঞতা নানাদিক থেকে কবিতাটির মধ্যে প্রবেশ করুক।

এক দশকেরও বেশি আগে একটি মেয়ে এসেছিল আমার কাছে তার খাতাপত্র নিয়ে। তখন চাকরিসূত্রে আমাকে নানাজনের লেখা পড়তে হত। সে মেয়েটি ছিল একেবারেই নতুন। কিন্তু বাড়ি এসে অনেক রাত অবদি তার পাণ্ডুলিপিগুলো পড়েছিলাম। লেখার টান ছিল এরকম। এখন অনেকদিনই আর তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। জীবনস্রোতে যা হয়। যে যার মতো ভেসে চলে গিয়েছি। কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্নে একটি লাইব্রেরিতে গেলাম। বড় সেই লাইব্রেরিতে একটি বাংলা বিভাগও আছে। যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদ, তাঁদের বহুদিনের চেষ্টাতেই ওই বিভাগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। আমরা সেখানে খুব ছবি-টবি তোলাচ্ছি। সবাই খুশি। সেখানে আমার একটিও বই নেই দেখে কাবেরী কিছু দুঃখিত। এ আমি আগেও দেখেছি। এর অনেক বড় উদাহরণও আছে। লেখকদের স্ত্রী-রা প্রায়শই এরকম দুঃখিত হন। কী আর বলব, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লাইন-ই বলি : 'নিজ দুঃখে ছোটরা দুঃখিত।'

হঠাৎই দেখি সেই মেয়েটির দু'টি বই। সে এতদিনে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নাম। আমার মনে পড়ল, রাত্রিবেলা নিজের ঘরে বসে পড়ছি তার অমুদ্রিত লেখা। কাটাকুটিও আছে। আমার তখন মনে হতে পারত, তোমার নামের জল কারা পান করে? পুরোপুরি অন্য একটা অর্থে মনে হতে পারত তা হলে। এই এত দূর বিদেশের, এই লাইব্রেরি থেকে কয়েকজন বাঙালি, তোমার লেখা নিয়ে গিয়ে পড়ে। তাদের দু-একজনকে ছাড়া আর কাউকে আমি তো চিনি না। মনটা একটা খুশিতে ভরে উঠল। গৌরবেও। একদিন আমি পড়েছিলাম একা-একা। এখন কত মানুষ পড়ছে! তোমার নামের জল কারা পান করে!

শের আফগান-রূপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সে-নাটকে তাঁর এক দীর্ঘ সংলাপের মাঝখানে, একটু যেন বিরতি নিয়ে, হঠাৎ বলেছিলেন, না না, আমি আপনাদের কখনও বলব না আপনারা আমার মতো এইসব ভাবুন, এবং ভাবতে ভাবতে শের আফগান হয়ে যান, কিন্তু একবার, শুধু একবার একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকান। কী দেখবেন জানেন?

একটি কবিতার চোখের দিকে তাকালে, কত কী যে দেখা যায়! জীবন যত চলে, বয়স যত বাড়ে, অর্থস্তরও নানাভাবে বদলে যেতে থাকে কবিতার। জীবনেরও কি একটি স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, একক অর্থ হয়! মনে তো হয় না। আমার চারপাশের জীবন ও নিজেকে তো আমি কতভাবে বদলাতে দেখলাম।

এই কবি, তারাপদ রায়ও নিজেকে বদলে ছিলেন। মধ্যবয়স থেকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কবিতাভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেন। যে-ভাষার পিছনে কাজ করত এক কবিদৃষ্টি যা বাংলা কবিতায় একেবারে নতুন ও আলাদা। কিন্তু সে-কথা পরে।

আজ বরং তাঁর এমন দু-একটি কবিতার কথা বলি, যেগুলো তত পরিচিত নয়। 'ঘোড়া ও নাবালিকা' এমনই একটি কবিতা।

ঘোড়া ও নাবালিকা
ছাদে চাঁদ ছিল, ছিল শিশু
নাবালিকা
ভয় পেয়েছিল খুব ভয়ের সুবাদে

বয়স কালের ঘোড়া উঠেছিল ছাদে
উঠেছিল চাঁদ
একা একা অনেক উপরে
ছাদে চড়ে
শিখা
নাবালিকা
ঘোড়া আর চাঁদ দেখে গণেছে প্রমাদ।

ঘোড়ায় নিয়েছে টেনে চাঁদের জঙ্গল
পশ্চিমের দিক থেকে সাংঘাতিক পুবে
শিখা
নাবালিকা
ছাদে ডুবে ডুবে
সন্ধেবেলা খেত কিছু জল
আজ তার পুবদিকে চাঁদের জঙ্গল

এই কবিতাটি কিন্তু তারাপদ রায় যে-ধরনের কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ সেই জাতের নয়। সমস্ত কবিতাটিতে একটি সাংকেতিক ভাষা, এবং তীব্র ও রুদ্ধ যৌনচাপের গোপন ধাক্কা, ও এমনকী তার সাময়িক মুক্তিও বলা আছে।

ছাদের নির্জনতা, সন্ধ্যাকাল, এবং গোপন বা হয়তো প্রথম যৌনতার আবির্ভাব। ভয় পেয়েছিল খুব ভয়ের সুবাদে। লাইনটি অব্যর্থ। কারণ, যৌনতাকে, কিশোরীরা একরকম ভয়ই তো পায়। ভয়ের সুবাদে—কারণ, একে ভয় পেতে হয়—সে কথা একটা মন জানে। আরেকটা মন, তার দিকে যেতে চায়। পেতেও চায় তার স্বাদ। তাই, 'ভয়ের সুবাদে'। নইলে ভয় কীসের! কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে, ধাপে ধাপে, এমনভাবে লাইনগুলো বিন্যস্ত করা, যেন ছাদের উচ্চতা ও নির্জনতা ফুটে ওঠে। কবিতাটি এই দ্বিতীয় স্তবকেই, সবচেয়ে কম কথা বলছে—কিন্তু তৈরি করে তুলেছে পুরো অ্যাটমস্ফিয়ারটাই। কবিতাটির দ্বিতীয় এই স্তবকে 'কম কথা' থাকার আরও কারণ হয়তো এই যে, ওইরকম পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ যে-সময় হঠাৎ-যৌনতা ঘটে, সে-সময়টা সাধারণত অনেক কথার দরকার হয় না। নীরবতা-ই তখন কথার কাজ করে। হয়তো চকিতে দু-একবার তাকানো, বা দুয়েকটি ভঙ্গি, একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়, পরে সেই বিদ্যুৎ-বিনিময় অবধারিতভাবে নেমে আসে শরীরে। তাই দ্বিতীয় স্তবকটির লাইন ও শব্দ-সংস্থাপনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তৃতীয় স্তবকে এসে, কবিতাটি, বলা যেতে পারে, একটি উপসংহার বলছে। মানে, কী থেকে কী হল। জঙ্গলের থেকে আসছে আদিমতা, চাঁদ থেকে, চন্দ্রাহতের মতো ঘোর, আর ঘোড়া থেকে উদ্দাম উচ্ছ্রিত পুরুষের আভাস। 'পশ্চিমের দিক থেকে সাংঘাতিক পুবে' কথাটি এক লাইনে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দিল। অনিচ্ছুক, বা আপাত অনিচ্ছা-দেখানো কিশোরীকে একদিক থেকে অন্যদিকে টেনে নিল। অর্থাৎ এখানে অনুমান করা যায় প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা। অন্তত যৌনস্পর্শের সঙ্গে কিছুবা দীর্ঘ পরিচিতি। কিন্তু প্রথম। পশ্চিম আর পুব এমনিতে এমন কিছু নয়। কিন্তু খুবই একটা চেনা জিনিসকে এমনভাবে ব্যবহার করা হল যাতে তা নতুন অর্থস্তর প্রকাশ করল। পশ্চিম আর পুবের কনট্রাস্ট কে না জানে! কিন্তু যেই বলা হল সাংঘাতিক পুবে—পুরো কবিতাটির মধ্যে এতক্ষণ ধরে স্থাপিত আবহাওয়ার ঝাপটে—সমস্তটাই ওই কিশোরীর রাজি হওয়া, অংশ নেওয়াকেও বলে দিল। প্রত্যেকটা স্তবকে একবার করে শিখা নাবালিকা কথাটা ঘুরে ঘুরে এসেছে। এবং সবসময়েই শিখা আর নাবালিকা আলাদা লাইনে থেকেছে—শিখার পরেও কোনও লাইনে কোনও শব্দ থাকেনি, নাবালিকার পরেও কোনও শব্দ সেই লাইনে থাকেনি। আর সেটা 'বলাকা'-র পরিচিত কৌশলে মিল রাখার জন্যও নয়। মূল কথাটা হল, শিখা নাবালিকা ঠিকই, কিন্তু, শিখা নাবালিকা থাকতে চায়নি, সে 'ভয়ের সুবাদে' মাত্র ভয় পেলেও, স্বাদ পেতে চেয়েছিল বেশি। হয়তো তার বাধা-দেওয়া মন সবটা জানত না। কিন্তু সে নাবালিকা থাকতে চায়নি এবং নাবালিকা থাকেওনি কবিতার শেষ দিকটায়। সে-কথা কবিতা-ই বলেছে, 'ছাদে ডুবে ডুবে/সন্ধেবেলা খেত কিছু জল'। মানে এটা তারপর মাঝে মাঝেই ঘটত। হঠাৎ-যৌনতার চরিত্র-ই এই, তারপর সে বারবার ঘটতে থাকবে। সুযোগ পেলেই তাই সন্ধেবেলার ছাদ। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র কবিতার ছন্দ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে, একবার বলেছিলেন : 'মাত্রাবৃত্ত-মুক্তক যদি একবার সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে তার বারবার সম্ভব হওয়ার পথে বাধা রইল কোথায়?' ঠিকই, 'মাত্রাবৃত্ত-মুক্তক'-এর ক্ষেত্রে বারবার সম্ভব হওয়ার পথে কোনও বাধা নেই। কিন্তু এইরকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে আছে। সামাজিক বাধা। কয়েকবার ঘটবে। তারপর জানাজানি হবে। তারপর দূরত্ব হবে। প্রায়-সমস্ত গোপন কৈশোর প্রেম বা শরীর-আস্বাদ অভিজ্ঞতা কখনওই বেশিদিন চলে না, একসময় ছিন্ন হয়ে যায়। তারই বর্ণনা, সংকেতময় উপসংহার, কবিতাটির শেষ লাইনে। ওই যে, ছাদে ডুবে ডুবে সন্ধেবেলা খেত কিছু জল—ওর মধ্যে ওদের ওই যোগাযোগটা যে অনেকটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, অন্তত কিছুদিনের জন্য হয়ে পড়েছিল, সে কথার আভাসও আছে। ওই ব্যাপারটা যে কিছুদিনের জন্য নিয়মিত হয়ে পড়েছিল, তা বোঝাতে মাত্র একটি কথা ব্যবহার করা হয়েছে। 'খেত কিছু জল'-এর 'খেত' শব্দটি। এবং ডুবে ডুবে। অর্থাৎ কাউকে না জানিয়ে। এখন নিশ্চয়ই তার ছাদের সেইসব সন্ধে মনে পড়ে। সে ছিল এ-সবের উল্টোদিকে, পশ্চিমে। এসে পড়ল এ-সবের মধ্যে। পুবে। ঘোড়াটির টানে। নিজের টানেও। আজ তার পুবদিকে চাঁদের জঙ্গল। স্বীকার করব, এই লাইনটি এখনও আমার কাছে কিছুটা আবছা হয়েই আছে। আমি যেটুকু যেমনভাবে বুঝি, সেটা যেমন বলি, তেমনই যে-জায়গাটা ধরতে পারি না ঠিকমতো, সেটাও বলি। 'আজ' কথাটা থাকায় এবং তার আগের লাইনে 'খেত' এই কথাটাতেও মনে হচ্ছে, অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। নইলে আজ আসবে কেন। এমনিতেই, এ কবিতাটি কিন্তু, অনেকগুলো ধাপ বলেছে। অনেকটা সময়ও পার করেছে। শেষ লাইনে, মেয়েটিকে, একাকিনী বলেই আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি। ওই সন্ধেবেলার ছাদে, সে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মনে মনে বলছি তো কতদিন ধরেই : আজ তার পুবদিকে চাঁদের জঙ্গল। আজ তার পুবদিকে চাঁদের জঙ্গল। কেন বলছি? কেন বলি? ওই 'তার'-টা কি দিনে দিনে, কবিতাকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এসেছে? না কি 'আজ তার পুবদিকে চাঁদের জঙ্গল' বললে কোনওভাবে নিজের কথা মনে পড়ে? ওই 'তার'-টা কি 'আমি' হয়ে যায়? জানি না। তবে মেয়েটিকে আমি এখনও একা-একা ছাদে দেখতে পাই। সন্ধেবেলা। কবিতার মেয়েটিকে। কবিতাটি যখন পড়েছিলাম, তখনকার সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই আজ আর কিশোরী নেই। কিন্তু, তার নাবালিকা সাঁঝবেলাটি আজও ওই ছাদে রয়ে গিয়েছে যে-ছাদ তাকে নাবালিকা রাখেনি। গোপন সম্পর্কে এনেছিল।

এই শেষ লাইনটির বিষয়ে চন্দ্রিল ভট্টাচার্য তার অন্যমত জানাল। আশ্চর্য অন্যমত। সে, কবিতাটিকে, একেবারেই এরকম কোনও বিচ্ছেদের দিক থেকে দেখছে না। তার মনে হচ্ছে, একসময় কিশোরীকে হয়তো কিছুটা জোর করেই 'চাঁদের জঙ্গল'-এ টেনে আনা হয়েছিল। 'চাঁদের জঙ্গল'-এ অনেক যৌন-অনুষঙ্গ সে দেখছে, এবং অব্যর্থই দেখছে। আর আজ সেই মেয়ে 'চাঁদের জঙ্গল'-এর একেবারে কেন্দ্রে আসীনা। অর্থাৎ, সে আর নাবালিকা নেই। স্বাদ পেতে অভ্যস্ত হয়েছে।

এইটাই 'গোসাঁইবাগান'-এর লক্ষ্য। সমস্ত পাঠক মনে-মনে একটি কবিতা পড়ে নিজের-নিজের 'গোসাঁইবাগান' তৈরি করে নিচ্ছে। ফলে আমিও নতুন নতুন দিক দেখতে পাই কবিতার।

আচ্ছা, একেবারে এর উল্টো দিকের একটি কবিতা বলি এবার, এও এক সম্পর্কেরই কবিতা।

জবানবন্দী
সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

হুজুর, ধর্মাবতার,
প্রয়াতা শান্তিলতার সঙ্গে মদীয়ের
কোনো রকম খারাপ সম্পর্ক ছিলো না।
ইহা সত্য যে, একবার মৌরিগ্রাম হইতে
তাঁহাকে থলকমলের চারা আনিয়া দেই।
আমাদের বংশে স্থলপদ্ম, বকফুল ইত্যাদি
কিছু কিছু গাছ লাগানোর আস্য নাই।
হুজুর, ধর্মাবতার,
আস্য কথাটির অর্থ বলা কঠিন,
সোজা করিয়া বলা যহিতে পারে
ঐ সব গাছ লাগানো নিষেধ আছে।
যাহা হউক, আশা ছিলো প্রতিবেশিনী শান্তিলতা
তাহার পিছনের বাগানে ঐ গাছ লাগাইবে,
প্রতিদিন সকালে আমার দক্ষিণের জানালা দিয়া
থলকমলের শোভা দেখিব।
শান্তিলতা তাহাই করিয়াছিল।
আমিও নিয়মিত শোভা দেখিতাম।
মনের অগোচর পাপ নাই,
দুই-এক দিন শান্তিলতাকেও দেখিতাম।
হুজুর, ধর্মাবতার,
ইহা অপেক্ষা খারাপ সম্পর্ক
তাহার সঙ্গে আমার ছিলো না।

আগের যে-কবিতাটি বললাম, 'ঘোড়া ও নাবালিকা' সেই লেখায় নানা রহস্য ও সংকেত। আর সেটাই ওই লেখাটির পড়ার উত্তেজনা ও আনন্দ। ধাপে ধাপে এগনো, ছন্দ এবং খেলাচ্ছলে ফেলে-রাখা মিল লাগানো, এবং সব কিছুর মধ্যেই কোনও-না-কোনও চাবি খুলতে খুলতে চলা, প্রথম স্তবক পাঁচ লাইন, দ্বিতীয়টি ছয়, এবং তৃতীয় স্তবক সাত লাইন, অর্থাৎ এর মধ্যেও ধাপ বা সিঁড়ি—এবং শেষ লাইনটিকে একাধিক অর্থরহস্যের জন্য খুলে দেওয়া—এর কোনও কিছুই 'জবানবন্দী' কবিতাটিতে নেওয়া হয়নি। না, একটা নেওয়া হয়েছে—ধাপে ধাপে এগনো। আগের কবিতায় ধাপগুলো গোপন রাখা হচ্ছিল, দ্বিতীয়-তৃতীয় পাঠে ধরা যাচ্ছে। এখানে ধাপ আছে, কিন্তু ধাপ খুলে খুলে রাখা।

এর একটা মস্ত বড় কারণ যে দু'টি কবিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। প্রথমটি আছে 'ছিলাম ভালবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন' নামক বইতে যা ১৯৬৭-তে প্রকাশিত। আর পরেরটি রয়েছে 'জলের মতো কবিতা' গ্রন্থে।

এই বই বেরিয়েছে ১৯৯২-তে। ২৫ বছরের ব্যবধান দু'টি বইয়ের। এবং তারাপদ রায়ের কবিতার স্টাইল বা ধরন একেবারে বদলে গিয়েছে এর মধ্যে, অনেকদিনই। কিন্তু আগেই বলেছি, আশ্চর্য সেই জন্মান্তর নিয়ে কথা বলব আর একদিন। এই কবিতাতেও দু'টিই চরিত্র। আরেকজন আছেন, তিনি ধর্মাবতার। ইনি ঈশ্বরও হতে পারেন। এই ঈশ্বরকে একদিন তারাপদ রায়ের কবিতা বলেছিল :

কেন কলকাতার পথে পথে একটি নমস্কারে প্রভু,
একটি নমস্কারে
সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখব, কেন দেখা হবে বারবার প্রতিদিন
ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে পাঁচ মাথার ক্লান্ত গণ্ডগোলে!

বলা বাহুল্য, এই যে ধর্মাবতার, এর মধ্যে জীবন-শেষের ঈশ্বর মিশে থাকলেও, ইতিমধ্যেই তারাপদ রায়ের কবিতায় সেটলমেন্ট তাঁবু, জরিপ, পপার, ভিক্ষুক, দারিদ্ররেখা এইসব দেখা দিচ্ছে, এবং দিতে থাকবে। ম্যাজিস্ট্রেট, এজলাস ইত্যাদির সঙ্গে কর্মসূত্রে পরিচিতি ঘটছে যা তাঁর নানা গদ্যলেখা থেকে জানা যাচ্ছে। আর এই কবিতার ধর্মাবতার কেবলই ঠাট্টার পাত্র নন। তারাপদ রায়ের কবি-চরিত্রে নিজেকে নিয়ে কৌতুক বরাবরই আছে। এবং সেই কৌতুক, সব সময়ই তার কবিতাকে অন্য রং অন্য রৌদ্র ঢেলে মুক্তি দান করতে করতে চলেছে।

এই কবিতায় তিনি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় নেমেছেন। একেবারে যেন সোজা করে বলছেন। জবানবন্দি দেওয়ার মতো সোজা। এবং জবানবন্দি দেওয়ার মতোই ধাপে ধাপে, বলা। অনেকটা যেন, আচ্ছা তারপর? তারপর কী হল? এইরকম একটা ভাব। প্রশ্নটা নেই কোথাও—কিন্তু, জবানবন্দি যে দেয় কোনও আসামী, সে তো প্রশ্নের উত্তরেই দেয়। তাকে দোষী বলা হলে সে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে! এখানে সাধুভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা, প্রথমত, জবানবন্দি ইত্যাদি খুবই পোশাকি বা যাকে বলে ফর্মাল ব্যাপার। আগেকার দিনে এগুলো ওইরকম ভাবেই লেখা হত, সাধুভাষায়। একজন আরেকজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আর থানায় সাধুভাষায় কমপ্লেন লিখে জমা দিল যে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে সে-ই, এও তো হত গ্রামেগঞ্জে। 'এফআইআর'-এর মতো অতখানি আইনি টার্ম তো সাধারণ মানুষ আগে বলত না। দ্বিতীয়ত, প্রয়াতার নাম শান্তিলতা। এতে বোঝা যায় যে, কবিতার এই দুই চরিত্র, নারী ও পুরুষ, উভয়েরই জীবন-সায়াহ্ন। ইচ্ছে করেই শান্তিলতা নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। শান্তিলতা চরিত্র-নামটি পুরনোকাল-কে বোঝাবে। পুরো লেখাটিই এইভাবে, সহজ-সরল একটি জীবনযাত্রাকে বলতে বলতে চলেছে। যেখানে এ-বাড়ির উঠোনেও বাগান। ও-বাড়ির পিছনেও গাছপালা লাগানোর জায়গা। আমাদের কিছু কিছু গাছ লাগানোর আস্য নাই, তাই, থলকমলের চারা শান্তিলতাকে এনে দেওয়া। নইলে নিজেদের বাড়িতেও গাছপালা করা আছে তার ইঙ্গিত রয়েছে। 'আস্য' কথাটির অর্থ যে নিষেধ—তা পরিষ্কার বলা হল। কবিতাটা কেন লেখা হচ্ছে? 'খারাপ সম্পর্ক' বা যে-সম্পর্ক গড়ার নিষেধ আছে, তার মধ্যে তুমি গিয়েছিলে কি না, এই অভিযোগের উত্তর হিসেবে কবিতাটি যেন লেখা হচ্ছে। 'আস্য' নামে পরিচিত গাছ লাগানোর নিষেধের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার নিষেধেরও আর একটা যোগ এই দিক দিয়ে। এবং সত্যিই দেখা গেল, 'মদীয়ের' সঙ্গে শান্তিলতার কোনও 'খারাপ সম্পর্ক'-ই ছিল না।

একজন জানলা দিয়ে, স্থলপদ্ম দেখার ছলে, আরও একজনকে দেখত। এইটুকু। মাত্র এইটুকু। এবং, মাত্র এইটুকুতে 'প্রেম' হয় কি না বলতে পারব না, কিন্তু অসামান্য প্রেমের কবিতা যে হয়, এ লেখা তার প্রমাণ। এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম, যতদিন বাংলা কবিতা থাকবে, এ কবিতাও বাঁচবে। বলতে গিয়ে ঝোঁক সামলে নিলাম। নতুন যে জীবনধারা এসে পড়েছে, নতুন যে ছেলেমেয়েরা আসছে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কতই সুদূর এ কবিতার অনুভব। তারা কি বুঝতে পারবে এর বেদনা? এর আনন্দ? এই কবিতায় রয়েছে এমন একটি মন যে, কত কম নিয়ে, অল্প নিয়ে, ভরে থাকতে পারে। ভাল থাকতে পারে। তা-ই তো থাকত। কিন্তু শান্তিলতা তো আর নেই। সে প্রয়াতা। সেই কষ্ট থেকেই তো এ কবিতা কথা বলছে।

কিন্তু সেই কষ্টকে সারাক্ষণ গোপন করা আছে। আর এই কবিতা, নম্র ও বিনীতভাবে, একবারও স্পষ্ট করে না বলে—একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে রাখে। 'খারাপ সম্পর্ক' বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, যাকে আমরা চিহ্নিত করি 'খারাপ সম্পর্ক' বলে—তাকে কোন তুলাদণ্ডে মাপা যায়?' সত্যিই কি, এ কবিতা যে-অর্থে বলছে, সে-অর্থে খারাপ সম্পর্ক বলে কিছু হয়? সে কি মানুষের কুশ্রী মনের চাপিয়ে দেওয়া মাপকাঠি নয়? শুদ্ধ একটি স্নান এই আপাত-ভীরু কবিতাটি ধারণ করে আছে। মানুষের মনের পবিত্রতম অংশ প্রেম। তাকেই সে ধরে আছে। আপত্তি জানাচ্ছে, মোড়লসুলভ সামাজিক কর্তাবৃত্তির প্রতি—একবারও উঁচু গলায় আপত্তি না-জানিয়েও আসলে জানাচ্ছে—আপত্তি। প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে তার কুণ্ঠিত স্বর ও সংকোচ-বাচন দিয়ে। আর সেইখানেই এর শক্তি। বাইরের সব শিল্পকাজকে ভেতরে এনে ফেলেছে এ-কবিতা—নিজেকে 'সামান্য' রাখা অর্জন করেই এ-কবিতা অসামান্য হল।

এই যে তিনটি কবিতার কথা বলছি এতক্ষণ, তা নারী-পুরুষ সম্পর্কের কবিতা। যারা কাছে এসেছিল কখনও, কাছে থাকতে

পারেনি, থাকা সম্ভব হয়নি। কেউ বা কাছে আসেইনি। দূরে দূরে থেকেই দেখা দিয়েছে। এবার বলব, কাছে থাকার একটি কবিতা, তারাপদ রায়েরই।

পরমহংস
পায়ের কাছে জানলা খোলা
　　　　মাথার কাছে পরমহংস,
সবাই জানেন পরমহংস
　　　　আমার নয়, আমার স্ত্রীর,
মিনতি রায়ের পরমহংস
　　　　মাথার কাছে সমস্ত রাত।

জানলা দিয়ে বাতাস আসে,
　　　　বৃষ্টি এলে ঝাপটা আসে,
ভাগ্য যেদিন সুপ্রসন্ন
　　　　একটু আধটু জ্যোৎস্না ঢোকে—
জ্যোৎস্না আমার, বৃষ্টি আমার,
　　　　বাতাস আমার পরমহংস
মিনতি রায়ের মাথার কাছে
　　　　সমস্ত রাত জেগে থাকেন।

মিনতি রায়ের মাথার কাছে
　　　　আমার মাথা সমস্ত রাত,
এলোচুলের চেনা গন্ধ
　　　　লক্ষ্মীবিলাস জ্যোৎস্না আমার,
বৃষ্টি আমার, বাতাস আমার
　　　　সমস্ত রাত পরমহংস।

'৮১ সালে কালীকৃষ্ণ গুহ এবং অমিতাভ গুপ্ত, নিজেদের কবিতা সরু পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছিলেন। 'এক বছরের সামান্য কবিতা' তার নাম। অর্থাৎ নিজেদের এক বছরের লেখা থেকে সিলেকশন। এর মধ্যে হয়তো সুপ্ত একটি লক্ষ্য ছিল, সাধারণত শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের যে-সিরিজ দোকানে পাওয়া যায়, তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো। তাই 'সামান্য' শব্দটির নির্বাচন। তবে তারাপদ রায়ের এই কবিতা 'সামান্য' শব্দের পরিচয়চিহ্ন ছাড়াই যথার্থভাবে সামান্য। মানে, তার উপকরণ অত্যন্ত অল্প। বিষয়টিও প্রায় একতিল জমির মতো—সূচের আগায় যতটা মাটি ধরে, ততটুকু।

রাতবিছানার পায়ের কাছে জানলা খোলা, আর মাথার কাছে পরমহংস। এই নিয়ে এক দম্পতি ঘুমোন রাতে। এইটুকুই বিষয়। এই পরমহংস, রামকৃষ্ণদেবের ছবি হতে পারে, মূর্তি হতে পারে। আবার হতে পারে শ্বেতহংসের মূর্তিও। কী, তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। নির্দিষ্ট করে বরং বলা আছে ওই পরমহংস 'আমার নয়'। কার? 'আমার স্ত্রী'-র। সবাই জানেন, মানে ওই বাড়িতে যে আত্মীয় বা বন্ধুজন আসেন, তাঁরা জানেন। তাঁরা এও জানেন, যে তারাপদ রায়ের স্ত্রী-র নাম মিনতি রায়, যিনি, 'কয়েকজন' নামে একটি পত্রিকা, একেবারে অন্য আনন্দস্বাদের কবিতাকাগজ প্রকাশ করতেন। তাতে আমার মতো অনেকেরই ছেলেমানুষ বয়েসে কবিতা ছাপা হয়েছে। অল্পবয়সিদের গ্রাম-মফস্বল থেকে আসা লেখা উৎসাহ করে ছাপাতেন।

সেই মিনতি রায়ের 'পরমহংস'। 'আমার নয়।' এই 'মিনতি রায়ের' এবং 'আমার নয়' বলাটার মধ্যে একটি প্রসন্ন কৌতুক রয়েছে! নানাধরনের কৌতুককে, কবিতায়, বিভিন্ন মাত্রায় যেভাবে ব্যবহার করেছেন তারাপদ রায়, তা আর কোনও বাঙালি কবি করতে পারেননি। সে-সব কৌতুকের মধ্যে কখনও দুঃখ, কখনও শুদ্ধ এক নির্মলতা থাকত। সেইজন্যই তারাপদ রায়ের কবিতা পড়লে মন ভাল হয়ে যেত। এ কবিতার মধ্যেও একটি প্রসন্ন শান্ত রস রয়েছে। প্রেমের এইরকম রূপ কবিতায় বহুদিন ধরেই দুর্লভ হয়ে এসেছে।

একটি দম্পতি, বোঝা যায় পুরনো দম্পত্তি, তারা ঘুমন্ত। পায়ের কাছে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না বা বৃষ্টির ঝাপটা, খোলা হাওয়া আপনমনে আসে-যায় সারারাত। সারাবছর। হ্যাঁ, কবিতাটির মধ্যে বিভিন্ন ঋতুর আসা-যাওয়ার খবর না-বলেও বলে দেওয়া আছে। বাতাস, বৃষ্টি বা জ্যোৎস্নার উল্লেখে। লোকটি যেন ঘুমোয় না পুরোপুরি। আধোঘুমে বুঝতে পারে, এইসব যাওয়া আসা। আর 'জ্যোৎস্না আমার, বৃষ্টি আমার, বাতাস আমার পরমহংস' বলা মাত্র, এতক্ষণের এই বর্ণনাত্মক রচনাটি ঝাঁকি দিয়ে কবিতার স্তরে উঠে যায়। 'পরমহংস' শব্দটি তার সামর্থ্য উন্মোচন করতে শুরু করে। প্রথমবার, এ কেবল একটি বিবরণ। কী? না, 'পায়ের কাছে জানলা খোলা মাথার কাছে পরমহংস'। একটা সাধারণ কিন্তু স্পষ্ট ছবি। তারপর জানা গেল, 'মিনতি রায়ের পরমহংস', 'আমার নয়'। মানে কী? আমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাই না? হবে হয়তো। অন্তত খুবই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলা। আমার কাছে কোনগুলো ইমপর্ট্যান্ট? জানলা দিয়ে রাত্রিবাতাস, বৃষ্টিঝাপটা, কোনও কোনওদিন জ্যোৎস্নার দেখা পাওয়া।

প্রকৃতি। সেই রাত্রির ঘুমের আধোঘোরে, প্রকৃতি আসছেন, সেইটাই আমার পাওয়া। তখনই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলা : 'জ্যোৎস্না আমার, বৃষ্টি আমার, বাতাস আর পরমহংস'। মুহূর্তে পরমহংস রূপান্তরিত হলেন চিরপ্রকৃতিতে। অর্থান্তর অনেক দূর ব্যপ্ত হয়ে গেল। এবং পরের লাইনেই জানা যাচ্ছে, সেই পরমহংস 'মিনতি রায়ের মাথার কাছে সমস্ত রাত জেগে থাকেন'! প্রথমে যা ছিল মাথার কাছে রাখা একটি মূর্তি শুধু, এখন সে-ই মূর্তিই জাগ্রত হয়ে উঠলেন। কারণ দেবতারূপে তিনি জেগে আছেন শিয়রে। এখানে 'থাকেন' কথাটির ব্যবহার সেই অনুভবটি প্রকাশ করল। এতক্ষণ কিন্তু 'পরমহংস'-এর আগে-পরে—আছে বা আছেন থাকে বা থাকেন—এমন কিছু ব্যবহার করা হয়নি। এখন হল। মাথার কাছে তাঁর আশীর্বাদ যেন। কিন্তু এইখানেই কবিতাটি থেমে গেল না। এই কবিতা এরপরই চলে গেল, অন্যদিকে। মিনতি রায়ের মাথার কাছে পরমহংস যেমন জেগে থাকেন তেমনি 'মিনতি রায়ের মাথার কাছে আমার মাথা সমস্ত রাত।' আর সেখানে কী? এলোচুলের চেনা গন্ধ, এই পর্যন্ত তাও অনুমানের মধ্যে আসে—কিন্তু এরপরই 'লক্ষ্মীবিলাস জ্যোৎস্না আমার', লাইনটি আসা মাত্র আবার কবিতাটি নতুন সৌন্দর্যের জন্ম দিল।

লক্ষ্মীবিলাস তেলের গন্ধ, ঠিকই, কিন্তু 'লক্ষ্মীবিলাস জ্যোৎস্না আমার' এইটি যেন কোথাও সম্বোধনও হয়ে গেল। জীবনসঙ্গিনীর প্রতি সম্বোধন। কিন্তু একবারও না-ডেকে। 'লক্ষ্মী' কথাটিও এর মধ্যে রইল। 'ঘরের লক্ষ্মী।' চুলের বিশেষ সুবাসও রইল। কিন্তু এই সমস্তটা মিলে গেল এবার বৃষ্টি, বাতাস, রাত্রির সঙ্গে। সবটা মিলেই হয়ে উঠল পরমহংস। একজন মানুষ তার স্ত্রীর পাশে ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছেই শুধু, ওই যা বলেছি, আধোঘুম রাতে ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—এইটুকু নিয়েই এই প্রেমের কবিতা। যা শেষ পর্যন্ত পরমহংস হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে, একটি বৃদ্ধ মূর্তির ব্যবহার আছে, এমন এক লেখা মনে পড়ছে আমার শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের : 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'। সেও দাম্পত্যের কবিতা। বুদ্ধ মূর্তি যেখানে চরিত্রও। তবে একেবারেই বিপরীত দিকে গন্তব্য তার। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি' প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'এখানে টলস্টয়ের সঙ্গে ডস্টয়ভস্কির তুলনার প্রচণ্ড লোভ আমাকে সামলে যেতে হচ্ছে'—এখানেও তারাপদ রায় ও শরৎকুমারের বিপরীতমুখী দাম্পত্যের কবিতা দু'টি পাশাপাশি দেওয়ার ইচ্ছে সংবরণ করলাম আমি। আপাতত এই বিস্ময়েই গোসাঁইবাগান শেষ করি, যে, 'পরমহংস' শব্দটি, একটি প্রেমের কবিতায়, একটি কাছে-থাকার কবিতায় এসে কী আশ্চর্য নতুন রূপ ধারণ করল। এবং এই কবিতায় শরীর রইল, লক্ষ্মীবিলাস জ্যোৎস্না আমার, সারারাতের শরীর, এমনকী হয়তো, ছোঁয়াও, গন্ধ নেওয়া তো বটেই—রইল—কিন্তু সে শরীর যৌনতাময় শরীরস্পর্শকে পার হয়ে গেল প্রথম থেকেই। আর এইখানেও 'পরমহংস' শব্দটি আরও একটি অর্থান্তর যুক্ত করল কবিতায়।

দু ছক্কা পাঁচ চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

শুরু হল নতুন কলাম। র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

এ হপ্তার সেরা ভিলেন নিঃসন্দেহে ২০১০। হতচ্ছাড়া এসেই প্রত্যেকের এক বছর করে বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। আঠেরো তাতে উদাসীন, পঁচিশ উদ্বিগ্ন, উনতিরিশ তটস্থ, উনচল্লিশ ভার্চুয়ালি মূর্ছিত : এমন সান্ত্বনাহীন শোকের দিন তারও এল! খবরকাগজ খুলে ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টে মৃতের তালিকায় হঠাৎ নিজ নাম দেখার মতো সে প্রগাঢ় আঁতকে উঠেছে। আর উনপঞ্চাশের কথা না-বলাই ভাল। সে দাড়ি অবধি কামাচ্ছে না, ক্ষুর যদি তার সত্যি ইচ্ছের আন্দাজটুকুও পেয়ে সড়সড় করে গলার কাছটা খেলতে আসে! মানুষ এমনিতেই ঝঞ্ঝাটে আছে। তার ওপর কে যে খামোকা এই অনন্ত সকাল-বিকেলকে, আকাশের এদিক থেকে ওদিক বরাবর টানা আলো ও ঝুপসির লীলাকে, এলোপাথাড়ি ভাগ করে কয়েকটা একক-এ ভেঙে নেওয়ার পরামর্শ দিল! এতে লাভই বা হল কার, কিংফিশার ছাড়া? আর তাদের ক্যালেন্ডার প্রকাশ্য বৈঠকখানায় টাঙিয়ে নয়নভরে ছানতে পায় এমন আশ্চর্য সৌভাগ্যওলা বেহায়া ছাড়া? কার হঠাৎ মনে হল, সময়কে নরম মাটিতে গণিত পেতে ফেলা যাক ফাঁদে, যাতে সে হয়ে ওঠে জরিপযোগ্য, মণিবন্ধগ্রাহ্য, দিন-মাস-বছরের হিসেব-ভাড়াটে?

সে পাঁজিবাগীশ ব্যাটা অনেক চেষ্টা করে খানদুই মোচ্ছবের রাত সৃষ্টি করতে পেরেছে বটে, লাল করে দিতে পেরেছে কতিপয় গ্রিটিংস কার্ড কোম্পানিকে, ফঙ্গবেনে মানুষকে মিথ্যে অটো-সাজেশনে অভ্যস্ত করতে পেরেছে যে নয়াপর্যায়ে সে ফের ঘুরে দাঁড়াবে এবং সাপটে মোচড়াবে জীবনের ন্যাজ, কিন্তু কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ হিসেবে লভেছে নরকুলের মৌলিক সর্বনাশ। না, পুরো প্যাকেজটা খারাপ নয়, যৌনতার কিঞ্চিৎ সুবিধে তো অবশ্যই, বিদেশি সিনেমায় তো দেখি একত্রিশ ডিসেম্বর রাত বারোটা বাজল আর অমনি সটাসট জড়িয়ে চুমু! প্রাচ্যে অবশ্য ওইসব ঘিনঘিনে রিচুয়াল পূর্ণ নো-এন্ট্রি, ছি, অপরের সঙ্গে মর্যাদাসূচক ব্যবধান রেখে আমরা অল্প অল্প টলি, আর সোৎসাহে স্টেজের ওপর খুব বড় স্তন ও আরও বড় নিতম্বওলা গেস্ট-নর্তকীর ঝ্যাম্পোপ্যাম্পো দেখি। কিন্তু খাড়াও খাড়াও, শুধু এই সামান্য কার্নিভালটুকু পাওয়ার জন্য আমাদের বুকে প্রোথিত হল একটা গোটা আনখা হিসেব-সিস্টেম? একটা বিশ্বব্যাপী যুগব্যাপী অনড় বুটিদার গোছগাছ? যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, চুপ করে বসে বসে গাছের বাকলে কাঠপিঁপড়ের লাইন দেখা কুকুরের, সেই অবিশ্বাস্য স্রোতকে ছোট ছোট চৌকোয় কেটেকুটে, ঘড়ির কাঁটায় বেড় দিয়ে, নামকরণ করে, দাগিয়ে, তৈরি হল একটা বিন্যাস-কাণ্ড? কেন?

সময়ের চেয়ে খতরনাক প্রাণী আর কে? সে বাঘকে অবধি খড়মড় করে খেয়ে ফ্যালে। ডোরাকাটা মাংস ধামসে নিমেষে বের করে ফকফকে হাড়, সেই হাড় দেখতে না-দেখতে গুঁড়ো গুঁড়ো মিশিয়ে দেয় ধুলোয়, সেই ধুলো থেকে উজিয়ে তোলে ছোট্ট ছোট্ট সতোরোখান বেগনি রঙের ফুল, তাদের সঙ্গে টুকটাক সেঁটে দেয় তুরতুরে পাতা, আর এই সবই সে করে দিনপাঁচেকের মধ্যেই এই ফুলপাতাদের কচরমচর চিবিয়ে ফেলবে বলে। তার কষদাঁতের ফাঁকে নিষ্ঠুর মাড়িতে লেগে থাকে সক্রেটিস, মিশরীয় সভ্যতা, পিট্টু, ছাদ-ট্যাংকের আড়ালে প্রেম, বাংলা মহাভারতের আলাভোলা অন্ত্যমিল। আর এ তো আমরা জানিই, কী পেল্লায় আনন্দে সে টানটান ত্বকে বুনে দেয় ক্রিসক্রস বলিরেখা, পানপাতা মুখ দুমড়ে তৈরি করে বীভৎস ইয়ার্কি-মুখোশ, মিরাকল-সমর্থ আঙুলকে করে তোলে কাঁপা কাঁপা, আত্মবিশ্বাসহীন। মানুষের প্রতিটি প্রসন্নতাকে সে কুপিয়ে খুন করে। এই নৃশংস ও ধর্ষকামী শয়তানটির বিরুদ্ধে আমাদের একটিও বল্লম, কুটো-প্রতিরোধও নেই। যখন শিশু প্রথম জানতে পারে, সবাই একদিন মরে যাবে, সব্বাই, এমনকী বাবা-মা, আর, ও ভগবান গো, সে নিজেও, তার এই সতেজ আঙুলগুলোর ভেতরে সর্বক্ষণ নড়ে উঠছে কঙ্কাল, আয়নায় তাকালে স্নিগ্ধ মুখের আড়ালে সমঝদার ঘাড় নাড়িয়ে যাচ্ছে দগদগে খুলি, তার





টুঁটিতে কে নাখুন চালিয়ে দেয়, সে হাঁকুপাঁকু ছুটে সবাইকে টেনে ধরে বলতে থাকে, ওগো, তোমরা কেউ কিছু করছ না কেন, তার মনে হয় পৃথিবীর প্রতিটি লোকের যেখানে সর্বক্ষণ শুধু এই সমস্যার সমাধানে ঝাঁপিয়ে নিয়োজিত থাকা উচিত, তখন কী করে এরা হাসিমুখে ঘুরছেফিরছে দেওঘর যাচ্ছে পুজোর জামা নিয়ে আকচাআকচি করছে? সে মাড়-দেওয়া ওয়াড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে গাল ছিঁড়ে ফ্যালে, নেই-এর দিকে এগিয়ে যাওয়াকে দেওয়াল খামচে থামাতে চায়। তারপর এক সময় হাঁউমাউ সাঙ্গ করে ঝিমিয়ে পড়ে, রোজ নিয়ম ধরে মার-খাওয়া বন্দির মতো, লুটিয়ে ফিরে যায় নিজগর্তে। এবং শেষে, অভ্যাস করে নেয় এই করালবদন মনস্টারটির বিরুদ্ধে মানুষের একমাত্র চর্যা : বিস্মৃতি।

ভুলে থাকা। মিস্তিরির সঙ্গে চুনকাম নিয়ে ঝগড়া। গোপাল ভাঁড়ের বই ট্রেন থেকে কিনে বিধবা পিসিকে অবধি অতিষ্ঠ করে দেওয়া জোরে জোরে তেরো নম্বর পাতা পড়ে শুনিয়ে। হাড়ের ওপর ন্যস্ত মাংসে চুমু, বারবার। রবারের বল দেওয়ালে মেরে ফের লুফে নেওয়ার প্রতি খর মনোযোগ। মাঝে মাঝে এর-তার অবসানে শ্মশানে গিয়ে সাঁৎ সাঁৎ সত্যিটার চাবুক খাওয়া, তারপর বাইরের বেঞ্চি থেকে ঘুঁটে-বিস্কুট কেনা, অস্থি নিতে গিয়ে চোয়াড়ে ঘুষখোরের সঙ্গে দরাদরি, তা ছাড়া অফিসেও মিটিং, থাকতে পারব না মাসিমা, ওবলা আসব। এবং সত্যিই, মিটিং-এ গিয়ে দিব্যি হাসাহাসি, কিছু ইস ইস চুকচুক, ফের হাসি, ক্লান্ত মুখটির চুল্লি-প্রবেশের নীতিকথা খচাৎ খচাৎ ও তুঙ্গ-তৎপর ডিলিট। জ্যামে গাড়িটার পাশেই কাচঢাকা লম্বা যান এসে থামলে তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলা, দিলীপবাবু, আপনি বাঁদিক ধরে নিন। টার্ন নিতে না-নিতে নতুন পোস্টারে রণবীর কাপুর, আরেশ্শাটি, এটা দেখতেই হবে। এই বিস্মরণের তুমুল ক্ষমতা ছাড়া মানুষ আর একটি পতাকাও উত্তোলন করতে পারেনি, পারবে না, সময়ের সঙ্গে যুদ্ধে। খুব আশ্চর্য, কোনও মনে-রাখার মতো সদর্থক ও তালিকুড়নো গুণ নয়, বরং ভুলে যাওয়ার অলৌকিক রসায়ন তাকে জীবনের সবচেয়ে জরুরি দস্তানা দিয়েছে। শুধু চিন্তাটা আসামাত্র তাকে মাথার পেছনে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, তক্ষুনি অন্য একটা চিন্তা এনে তাকে ঢাকা দিয়ে দেওয়ার রিফ্লেক্স, হয়তো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লোকে

নিজে সুর তৈরি করে গুনগুন করত। কাল বা পরশু অবধারিত গ্যাস চেম্বার, এটা সত্যি সত্যি উপলব্ধি করলে, একটা আঙুলও নাড়ানো যেত কী? ফাঁসির আসামি পায়খানা যাওয়ার শক্তিটাও পেত কী? অসীম আয়ুধ : এই নিজেকে মনে-না-পড়ানো, এই ঢাকুরিয়া লেক-এর ধারে বিচ্ছেদকে জরুরি বলে ভাবা, এই প্রকটতম দুশ্চিন্তাকে চিন্তা থেকে নির্বাসন দিয়ে যুগ যুগ কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। চাঁদে যাওয়া জাত এই একটা ব্যাপারে একমত : এ লড়াই হারার লড়াই, তবুও লড়তে হবে।

তা হলে সেই সময়কে ফের এতখানি পাত্তা দেওয়ার কল কেন বানানো? যেখানে দেখছি আমার ডিফেন্স-টা, একমাত্র ডিফেন্স-টা হল, তাকে পাত্তা না-দেওয়া? তাকে 'চুপ!' ধমকে দাবিয়ে রাখা? কেন এই প্রবহমান সময়কে জাস্ট তার মতো বয়ে যেতে না-দিয়ে, তার আপাত-অন্তহীনতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, তাকে আমাদের খুপরিতে ঠেলেগুঁজে, মেপে ওজন করে চোখের চামড়া টেনে দাঁত ঠুকে বুক-ধুকধুকি গুনে, সেধে ড্রাগনের ডানা-ঝাপটানের অশুভ হাওয়ায় সংসার ভরিয়ে দেওয়া? কেন ঘড়ি, কেন ক্যালেন্ডার, কেন জন্মদিন পালন, কেন তুখোড় তারিখবাজি করে আতিপাতি রেকর্ড রাখা ঠিক কবে বিয়ে হয়েছিল, ঠিক কবে বাবা চলে গিয়েছেন, ঠিক কবে আঁচিল প্রথম গজাল, ঠিক কতদিন হল ছাদে থিকথিক করছে শুঁয়োপোকা, ঠিক কতদিন হল নখ থেকে উধাও হল ছন্দ, ঠিক কতদিন পর আমার আর থাকার সম্ভাবনা নেই? কেন, এই তোল্লাই ও মুহর্মুহু অ্যালার্ম-ভজনা, অবান্তর হিসেবরক্ষা, সহজ স্রোতের ম্যাজিককে অপমান করে তার পাঁজরায় ক্যালকুলেটর ঠুসে দেওয়ার এই প্রাণপণ বজ্জাতি?

কী ক্ষতি হত, যদি লোকে বলত, কবে জন্মেছি কে জানে, শুনেছি সেই যেবার টোপা টোপা ফুলে উঠেছিল আমের মুকুল, আর বিয়ে করলাম যেবার হাওয়ার দাপটে ফুলে উঠছিল সবুজ সোয়েটার তাঁবুর মতো, আর রোগা মানুষকে দেখাচ্ছিল মোটা মানুষ? কী ক্ষতি হত? লোকে চাকরি করতে গিয়ে যদি বলত, কদ্দিন এসেছি এ গ্রহে, হিসেব নেই, কিন্তু কাজটা করতে পারি, এবং তাকেই যথেষ্ট মনে হয়? বয়সের ধারণাটা এসে কী ঘণ্টা হল? সময় মাপার কিছু একক ও কিছু যন্তর আবিষ্কার করে, নিখুঁত গুণেগেঁথে একটা তারিখ বলতে পেরে, একটা ঘণ্টা-মিনিটে নোটিস উথলে কোন এক্সট্রা হাতটা গজাল? বরং এই বখেড়াগুলোকে আকাশ থেকে না পাড়লে, সময়কে সত্যিই মনে হত অনন্ত, সমুদ্রের মতো নাছোড় ও প্রত্যাবর্তনপ্রবণ। মনে হত একটা বিছিয়ে থাকা লেপ, আমি যার দিক ঠাওরাতে পারি না। তাকে একমুখী, সরলরেখ, গোড়া মধ্য ও শেষ সম্পন্ন মনে হত না। বা একটু-আধটু হলেও, তা হানা দিত বহু আলগোছে। মৃত্যুর সময় টের পাওয়া যেত শেষ, জন্মের সময় বোঝা যেত শুরু, কিন্তু বিরাট মধ্যিখানটায় কূল পাওয়া যেত না। তখন নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চিৎসাঁতার। কারণ কত কত দুপুর যে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে আমার গোড়ালির পাশে পোষা বেড়ালের ন্যায় পাক খেয়ে খেয়ে, কত কত রাত্রি যে চলে যাচ্ছে আমাকে ফুঁড়ে দিয়ে, কত কত সন্ধ্যা যে মনখারাপের রুমাল এনে ঢেকে দিচ্ছে চোখ, কত কত দুপুর যে দুলিয়ে নিল তার ঝুরিতে, কত কত সন্ধ্যা যে হারমোনিয়ামের গলাসাধা দিয়ে ছিঁড়ে নিল কলজে, কিচ্ছু মাপ থাকত না, কোনও নাগাল থাকত না, কোনও পিলার উঁচিয়ে থাকত না ক্রোশ ক্রোশ দিগন্তে। স্মৃতি থাকত, কিন্তু কোনও লেবেল সাঁটা থাকত না তাতে। "ক'দিন হল?" প্রশ্নটারই মানে হত না। শুধু রোদ্দুর উঠত, অন্ধকার নামত, বারবার, আবার, অকল্পনীয় প্রসারে তা ঘিরে নিত আমাদের, একটা অখণ্ড বিরাট অবারিত মাঠে ফেলে দিত, আমরা কাজ করতাম, বসে থাকতাম, সন্তান মানুষ করতাম, কিন্তু কোঁচড়ে গজকাঠি খোঁচাত না, মনে হত একটাই আলো-আঁধারের বৃত্ত পাকে পাকে প্যাঁচে প্যাঁচে খুলে যাচ্ছে আমাদের সামনে, অশেষ পেঁয়াজের মতো, মনে হত একবার ছুট্রে গিয়ে ফিরে আসা কতগুলো ঢেউ বুঝি এরা, মনে হত একটা দীর্ঘ টলটলে ঝিল আমাদের বিছানা, যার আগুপিছু স্রোতের হিসেব আঁজলা তুলে তুলে করতে যায় কোন মূর্খ? যাকে অযথা ভয় পেয়ে ককিয়ে ওঠে কোন দুঃস্বপ্নতাড়িত উনপাঁজুরে?

কী হত এমন হলে? পৃথিবী কি হত অনেক ক্যাবলা? মন্থর? ল্যাদাড়ুস? সম্ভবত। সময় হুড়হুড় করে ফুরিয়ে আসছে রে, ওরে কী হবে, যা করার ত্বরায় করে ফ্যাল রে বাপ এই ভবে: পেছনে এই হনুমান লেলিয়ে না থাকলে মানুষ চুপ করে কান খুঁটিতে খুঁটিতে আরও কিছু বছর কিছু দশক নভ-কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকত সন্দেহ নেই। আমাদের বরাদ্দ মুহূর্তরাশি শেষ হয়ে আসার লাগাতার উচ্চণ্ড ভয়, আর ভাগে প্রদত্ত প্রতিটি নিমেষকে তুরন্ত বস্তুগত প্রাপ্তির নিরিখে দাঁড়িপাল্লায় চড়ানোর দায়—এগুলো না-থাকার দরুণ তাদের জীবন হত অনেক সুস্থিত ও প্রকৃত স্মার্ট, এ সন্দেহও করা যায়। আজকের দুনিয়ার সঙ্গে সে সময়-এককহীন বিশ্বের সবচেয়ে তফাত হত এই মনোভঙ্গিতেই। কেউ সর্বক্ষণ রেস-এর মোজা পরে ঘুমোত না, কেউ নিজের ছায়াকে দাঁড় করাত না চরম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, 'গ' লিটার সময়কে পড়িমরি অনুবাদ করে ফেলতে হবে 'ঘ' গ্যালন সাফল্যে নইলে নিজের কাছে মুখ দেখানো যাবে না—এই ঐকিক পাটিগণিত টাইপ ছ'মণি ক্রস কেউ নিজের ঘাড়ে স্বেচ্ছায় বহন করত না, কেউ এই ভেবে অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট খেত না যে চল্লিশ হয়ে গেল তবু ফ্ল্যাট হল না, কেউ সারাক্ষণ কষত না অমুক সাতাশে সিনেমা করে ফেলেছে তমুক বত্রিশে পেয়ে গেছে জ্ঞানপীঠ আর আমি ছেচল্লিশে রগড়াচ্ছি, কেউ ভাবত না ওহো পঞ্চাশ হয়ে গেল তার মানে তো হৃদয়ে প্রেমের মুকুল শুকোল, কেউ নিজের জীবনটাকে ইচ্ছেটাকে সত্তা-নিশপিশটাকে কতকগুলো জ্ঞাত বাটখারার সাপেক্ষে বিচার করার উদ্ভট ছকে ঢুকতই না, পাভলভ-কুত্তার ন্যায় যাপন হত না তখন, লোকে খিদে পেলে খেত, ঘণ্টা বাজলে নয়, 'চল্লিশ পেরোলেই চালশে বা কেলেস্টেরল'—এই বাক্যের অস্তিত্ব না-থাকার দরুণ তারা চালশে হলে চালশে দেখাতে যেত, চল্লিশ পেরোলে নয়। হ্যাঁ, হাত-পা তারা চ্যাঙাব্যাঙা ছুড়ত ঠিকই, কখনও হতাশায় কখনও আত্মহননের ওয়ার্ম-আপেও, কিন্তু সে আস্ফালন স্বাধীন ও মৌলিক। সময়ের মুঠিতে ঝুঁটি বেঁধে নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-নাড়ানি চলত না, কোনও ট্রাফিক সিগন্যালের তীরচিহ্ন এসে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছেআবেগকে সাতগিট্টু লাগিয়ে আদেশ দিত না : এইবার তোমার হতাশ হওয়া উচিত, আর ওই যে থার্ড বেঞ্চির বাঁয়ে, রোল নাইন্টিন, তুমি তিন গুনে তুড়ুক লাফিয়ে ওঠো আনন্দব্যাদানস হ। 'ওগো আমার যে এতটা কোটা ছিল তার যে আড়াই শতাংশ এর মধ্যেই পুরিয়ে গেল গো' মর্মে মড়াক্রন্দনে মথিত হত না পথঘাট। প্রতিটি মানুষ মনে করত সময় পড়ে আছে ছড়িয়ে আছে বাকি আছে অঢেল, অত কাছা খুলে ছোটাছুটির কিছু হয়নি, একটা দুপুর চলে গেলে আরেকটা দুপুর আসবে এবং এভাবেই এসে চলবে অঞ্জলিবদ্ধ করতলে গড়িয়ে পড়বে দুপুরসকল, ফলে আজ আচার না শুকোলে কাল শুকোবে, বড়ি কাগে খেয়ে গেলে কাল দেওয়া যাবে ফের, এক রজনী বৃথা গেলে আরেক রজনীতে সেঁকে নেওয়া যাবে জোছনার মুরোদ, এবং এভাবে সকলেই হত পুনর্জন্মময় ও ছিঁচকে-ভয় রহিত। পদক্ষেপ হত লঘু, ললাট থাকত ভাঁজহীন। কাজ ও আলস্যকে দেওয়া হত ইচ্ছের সম্মান। প্রতিজ্ঞাকে তারা এত সস্তা করে দেখত না যে নির্দিষ্ট দিন অন্তর তা রিনিউ করা যায়। জীবনকে তারা দেখত না খণ্ড খণ্ড চকোলেটচৌকোর মতো যে একটা এ খেয়ে নিলে ওর জন্য একটা কম পড়ে থাকে। তারা হত অমৃতের সন্তান, ঘড়ির বিষ্ঠা নয়। হ্যাঁ, তারা নির্দিষ্ট করে বলতে পারত না, ঠিক কবে আলো দিয়ে ঘেরা হবে পার্ক স্ট্রিট, আর বলিউডি নায়িকারা সম্মুখ-স্টেজে রুমাল-বিকিনি পরে অংশ-স্তন দেখাবে।

শুরু হল নতুন কলাম। প্রাচীনা-র নবীনবেলার কাহন

রোজদিন ঘুম ভাঙত মা'র গুনগুন গলায়। চোখ তখনও ভারী, ভোরের আলোর সামনে কবাটি টেনে জোর করে বন্ধ। বিছানা ছাড়ার আগে কাঁথার 'ওম'টাকে বেশ করে জড়িয়ে নিতে নিতে বুঝতাম, মা'র চান সারা। মা এবার পুজোর জোগাড় করছে। নকুলদানার শিশি থেকে চারটে সাদা গুলি পড়ল পেতলের থালায়। খস করে দেশলাইয়ের শব্দ হল, জানি এবার নাকে ধুপের গন্ধটা আসবে।

মা গুনগুন করে একটা গানই গাইত—ঠাকুর তোমায় ডাকব, আমার সময় কই?

প্রথম লাইনটাই মনে আছে। তার পরেরগুলো কেমন ঝাপসা।

রেডিওতে গান গাইলে গানের সঙ্গে যেমন বেহালা, বাঁশি, ঝুমঝুমি বাজে, মা'র খালি গলার গানের সঙ্গে রিনরিন করে বাজত মা'র চুড়ির গাছা, আর ছুনছুন করে বাজত মা'র চাবির গোছা।

এই যে আমার নাতনি সেদিন বললে,

—সত্যি তুমি সোনা-রুপো আওয়াজ দিয়ে চেনো?

বললুম হ্যাঁ। বিশ্বাস করল কি না জানি না।

এমনিতে আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘর ছিল তিনতলায়। আমার ঠাকুমার খুব শখ বলে ঠাকুর্দা শেষ বয়সে, প্রায় মারা যাওয়ার আগে, সাদা-কালো মার্বেলের টুকরো চৌখুপি করে বরফির মতো সাজিয়ে দিয়েছিলেন মেঝেতে।

সক্কালবেলা উঠে চান করে, শাশুড়িদের-জা-দের পালা মেনে, ঠাকুরঘরে গিয়ে পৌঁছে, পুজো সেরে আবার দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে আমাদের ভাই-বোনদের ঘুম থেকে তুলে, মুখ ধুইয়ে, চান করিয়ে, খাইয়ে, ইস্কুল পাঠাবার সময় পেত না মা।

তাই শোওয়ার ঘরের কোণেই একটা কুলুঙ্গিতে গোপাল ঠাকুরের পট আর লক্ষ্মীর সরা বসিয়ে নিয়েছিল। সেই তাকেই থাকত মা'র সিঁদুরের চুপড়ি। রোজকার সিঁদুর ফুরিয়ে গেলে সেখান থেকে আবার ঢেলে নিত খানিক।

সিঁদুর আর চাল নাকি ফুরোয় না, বাড়ন্ত হয়। ঠাকুমা তাই বলত।

এই যে মা নিজের ঘরে নিত্য পুজোর জোগাড়টুকু করে নিয়েছিল, এতে আমার ঠাকুমার ঘোর আপত্তি ছিল। কেবল নিজের মনে গজগজ করত,

—এই ঠাকুর আলাদা হল। এবার হেঁসেল আলাদা হবে, হাঁড়ি আলাদা হবে।

আমাদের বাড়িতে দু'টো হেঁসেল ছিল, আমিষ আর নিরামিষ। আমিষ হেঁসেলের ছোট একটা নাম ছিল—আঁশ হেঁসেল। রান্নাবান্নার পাট চুকে যাওয়ার পর দুপুরবেলা কখনও খালি হেঁসেলটাতে ঢুকলে কেমন যেন কান্না পেত। আগুন নেই, ধোঁয়া নেই, ছ্যাকছ্যাঁক নেই, মাছের গন্ধ নেই—কেবল নিকোনো মেঝের পাশে নালির গায়ে লোহার জালে কোনও কোনওদিন আটকে থাকত মাছের রুপোলি আঁশ। আমি মনে মনে কেন যেন ধরেই নিয়েছিলাম, সেই থেকেই আমিষ হেঁসেলের নাম আঁশ হেঁসেল।

নিরামিষ (ঠাকুমা বলত নিরিমিশ) হেঁসেলে ঠাকুমা আর আমাদের বাসুমতি রাঁধুনি সৌদোদিদির রান্না হত। আর দুপুরবেলা খাওয়ার পাট চুকলে ঠাকুর বালতি বালতি জল দিয়ে ছাদ অবধি ধুত সেই নিরিমিশে হেঁসেলের।

ঠাকুমাকে যখন বললুম,

—হেঁসেল আলাদা তো হয়েছেটা কী? তোমারও তো আলাদা হেঁসেল।

ঠাকুমা কেন যেন রেগে গিয়ে হাতপাখার বাড়ি আলতো করে মারল পিঠে।

—চুপ কর মুখপুড়ি। ও কথা মুখে আনে কেউ?

তখন সে রাগের মানে বুঝিনি।

এবার ভোরের আলো চড়া হল। মশারির ফাঁক দিয়ে মা'র মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছে না। কেবল হিরের নাকছাবিটা চিকচিক করছে।

ঠাকুমা বলত,

—হিরের নাকছাবি বাইজি পরে, বাড়ির বউ পরে সোনার নাকছাবি।

তবে মা কিনা আসলে ভাগলপুরের মেয়ে, মা নাকি নাক বেঁধানোর পর থেকেই পাথরের নাকছাবি পরে এসেছে বরাবর।

তখনও জানি না জড়োয়া গয়নার চল বেশিটাই উত্তর ভারতে। বাংলার মেয়েরা সোনার গয়নাই বেশি পরে।

ঠাকুমার নাকে-কানে ফুটো ছিল। শুধু দু'টো ফুটো। কোনও গয়না ছিল না। গয়না বলতে গলার তুলসীর মালাটুকু।

মাঝে মাঝে বিকেলের আলোয় বারান্দায় বসে বসে ঠাকুমার পাকাচুল তুলে দিতে দিতে দেখতাম বাঁ নাকের ছোট্ট একটা ফুটো, আর ঠাকুমার চিকচিকে চোখের জল যেন গাল বেয়ে নেমে এসে সেখানে একটা নাকছাবি বসিয়ে দেবে।

কেন যেন, বহুদিন অবধি মনে মনে ভাবতুম হলুদ বনে বনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গিয়েছে সুখ নেইকো মনে—

পদ্যটা আসলে ঠাকুমার লেখা।



চৈতন্য মৃত্যুরহস্য নিয়ে শুরু হল টানটান এক থ্রিলার

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

সদর স্ট্রিটের মুখে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল জয়দেব। যাক, ঠিক টাইমেই তা হলে মিউজিয়মে পৌঁছতে পারল। সুশোভনদা বলেছিলেন, বেলা ঠিক তিনটের সময় সদর স্ট্রিটে, মিউজিয়মের পিছনের গেটে এসে উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। পারমিশন নিয়ে রেখেছেন, ওকে ভিতরে নিয়ে যাবেন। জয়দেব জানে, এক মিনিট দেরি হলেও সুশোভনদা মারাত্মক চটবেন। নিজে খুব পাংচুয়াল, তাই কারও জন্য কোথাও অপেক্ষা করা উনি পছন্দ করেন না। হাতঘড়িতে নজর দিয়ে জয়দেব দেখল, তিনটে বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই, কাঁধের ব্যাগটা সামলে নিয়ে ও পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল।

এই সময়টায় সদর স্ট্রিটে লোকজন খুব বেশি দেখা যায় না। তবে কিছু বিদেশি মুখ চোখে পড়ে। এই অঞ্চলটায় বেশ কিছু ছোট হোটেল আছে। অল্প খরচে থাকা যায় বলে, বিদেশিরা এই সব হোটেলে এসে ওঠে। তাদের পিছনে ঘুরঘুর করে দালালরা। পুঁতির মালা, সেন্ট, রুপোর গয়না...এইরকম আরও অনেক জিনিস তিনগুণ দামে গছানোর চেষ্টা করে। সন্ধে নামলেই মাদক, এমনকী, যুবতী মেয়ের সন্ধানও দেয়। দালালরা কীভাবে এই বিদেশিদের উত্যক্ত করে, রাতে মিউজিয়মের গ্যালারি কীভাবে নিশিবাসর করে তোলে, তা নিয়ে একটা ফিচার লিখেছিল জয়দেব। ওর সেই লেখা নিয়ে তখন খুব হইচই হয়েছিল। সদর স্ট্রিট দিয়ে হাঁটার সময় সেকথা ওর মনে পড়ল।

ঠিক তিনটে বাজার এক মিনিট আগে জয়দেব গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক উল্টোদিকে আর্মেনিয়ানদের ছোট একটা গির্জা, বাচ্চাদের স্কুল। গেটের দু'ধারে লোহার দু'টো বিরাট কামান দেখে জয়দেব নিশ্চিন্ত হল, নাহ্, ঠিক জায়গায় এসেই ও দাঁড়িয়েছে। সুশোভনদা এখনও আসেননি। কলেজ স্ট্রিটে ওর বইয়ের দোকান থেকে জয়দেব রওনা হয়েছে প্রায় দেড়টার সময়। প্রথমে ট্যাক্সি পাচ্ছিল না। পনেরো বছরের পুরনো গাড়ি সরকার বাতিল করে দেওয়ার পর থেকে রাস্তায় ট্যাক্সির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হেঁটে এসে, যাও বা একটা খালি ট্যাক্সি পেল, ড্রাইভার বলল, কুড়ি টাকা বেশি দিতে হবে। আবদার শুনে মাথায় তড়াক করে রাগ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সুশোভনদার কথা ভেবে জয়দেব তখনকার মতো রাগ সামলে নিয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটের একটা ছোট্ট প্রকাশনা সংস্থার মালিক জয়দেব। বছর দুয়েক ধরে ও একটা মাসিক পত্রিকাও বের করছে। পত্রিকাটার নাম 'দিনকাল'। ওর পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখেন সুশোভনদা। আর্ট ও কালচার নিয়ে। শিল্প সমালোচক হিসেবে খুব নাম আছে সুশোভনদার। কলকাতার মিউজিয়ম নিয়ে একটা এক্সক্লুসিভ লেখা উনি দেবেন বলেছিলেন কয়েকদিন আগে। আগামী সংখ্যাটা বেরনোর সময় চলে এসেছে। অথচ লেখাটা জয়দেব পায়নি। প্রেস থেকে তাগাদা আসছে। বাধ্য হয়েই আজ সকালবেলায় সুশোভনদাকে ফোন করেছিল ও। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর সুশোভনদা ফোন ধরে খুব খুশিখুশি গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ম্যাগাজিনের সারকুলেশন কত জয়দেব?'

'খুব বেশি নয় সুশোভনদা। কেন বলুন তো?'

'এবার এমন একটা লেখা তোমায় দেব, ম্যাগাজিন দ্বিগুণ ছাপতে হবে। একেবারে হইচই পড়ে যাবে।'

'লেখাটা কী নিয়ে, বলবেন?'

'ফোনে বলা যাবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছ, তা নিয়ে। জানো, দিন কয়েক হল, আমার মনে হচ্ছে, আমার ফোনটা কেউ ট্যাপ করছে। সাবধানের মার নেই। তুমি কি আজ বেলা তিনটের সময় একবার মিউজিয়মে আসতে পারবে? সামনের গেটে নয় কিন্তু। তোমাকে এমন একটা জিনিস দেখাব, দেখে তুমি চমকে যাবে ভাই।'

ফোন ট্যাপিং-এর কথা শুনে, প্রসঙ্গটা আর টানতে চায়নি তখন জয়দেব। বলেছিল, 'মিউজিয়মের ওপর লেখাটা তা হলে আর এ সংখ্যায় দিচ্ছেন না। ঠিক আছে, আপনার এই এক্সক্লুসিভ লেখাটা করে পাব সুশোভনদা, আইডিয়া দেবেন?'

'আজই দিয়ে দেব। সেইসঙ্গে একটা পেন্টিং-এর কপি। ছবির সঙ্গে লেখাটা না ছাপলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন না। জানি না, আমি ঠিক করছি কি না। হয়তো প্রচণ্ড একটা ঝুঁকিই নিচ্ছি। কিন্তু তুমি তো জানেই, কাউকে আমি ভয় পাই না। আমি শুধু ভাবছি, তোমার কথা। লেখাটা ছেপে তুমি না আবার প্রবলেমে পড়ো! তুমি এসো, আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা সেরে নিই। তারপর...লেখাটা তুমি ছাপবে কি না, সেই ডিসিশন নিও।'

জয়দেব বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি যাব।'

কিন্তু সুশোভনদার পাত্তাই নেই। মিউজিয়মের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল জয়দেব। টানতে টানতে সেটা শেষ হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রায় সোয়া তিনটে বাজে। নাহ্, এত দেরি করার মানুষ তো সুশোভনদা নন। পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে ও সুশোভনদাকে ধরার চেষ্টা করল। রিং হয়েই যাচ্ছে। বারবার বলছে, নট রিচেবল। কী হল মানুষটার? গেলেন কোথায়? কী এমন লেখা উনি দিতে চান, যা নিয়ে প্রবলেমে পড়তে পারেন? গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জয়দেব বিভ্রান্ত। আজ পর্যন্ত কোনওদিন এমন হয়নি। লেখা দেবেন বলেছেন, অথচ সুশোভনদা লেখা



নিয়ে হাজির হননি।

প্রায় কুড়িটার মতো ওঁর প্রবন্ধ, দিনকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব প্রবন্ধ নিয়ে ভাল-মন্দ অনেক চিঠিও পেয়েছে জয়দেব। সুশোভনদার লেখার এমনই জোর যে, ওঁর সামান্য প্রশংসা অনেক অনামী শিল্পীর ভাগ্য বদলে দেয়। জয়দেব তার সাক্ষী। নামী শিল্পীরাও সমীহ করে চলেন সুশোভনদাকে। দিন কুড়ি আগে, জয়দেব প্রস্তাব দিয়েছিল, 'দিনকাল-এ আপনার যেসব লেখা বেরিয়েছে, সেগুলো নিয়ে যদি একটা বই বের করি, তা হলে আপনার আপত্তি নেই তো সুশোভনদা? আমি কিন্তু আপনাকে খুব বেশি টাকা দিতে পারব না।'

শুনে খুশি হয়েছিলেন সুশোভনদা, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয়, পাবলিশ কোরো।'

বইমেলায় সেই বই বেরনোর কথা। পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে জয়দেব। কাঁধের ঝোলায় রয়েছে। এক ঢিলে ও দুই পাখি মারবে। সুশোভনদাকে প্রুফ দেখে দিতে বলবে। সেইসঙ্গে যাতে বইয়ের নামটা উনি ঠিক করে দেন, সেই অনুরোধ করবে। কিন্তু কোথায় গেলেন মানুষটা? একবার ভিতরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবল জয়দেব। কিন্তু সিকিউরিটির লোক গেটে পাহারা দিচ্ছে। অনুমতি ছাড়া এদিক দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেবে না।

কিছুদিন আগে মিউজিয়ম থেকে প্রাচীন একটা বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছে। কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল। তারপর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। মাঝে একদিন কথায় কথায় সুশোভনদা বলে ফেলেছিলেন, 'কর্তাদের অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙল, বুঝলে? অ্যাদ্দিন ধরে যা চুরি হয়ে গিয়েছে, তার মূল্য কোটি কোটি টাকা।' কথাগুলো বলেই সেদিন উনি নিজেকে সামলে নেন। জয়দেব ওর পত্রিকায় এ নিয়ে আর্টিকেল লিখতে বলেছিল। কিন্তু সুশোভনদা রাজি হননি।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রায় চারটে বেজে গেল। জয়দেব বুঝে উঠতে পারল না, আর অপেক্ষা করা উচিত হবে কি না। একবার ভাবল, সুশোভনদার বাড়িতে ফোন করে খবর নেবে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন কি না, কে জানে? কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে থাকলে, সুশোভনদা ফোন করে অবশ্যই তা জানিয়ে দিতেন। উনি আগে থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের পৈত্রিক বাড়িতে। এখন থাকেন সল্টলেকে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বাড়িটা উনি তৈরি করেছিলেন, নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করবেন বলে। স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। একমাত্র ছেলে চাকরি করে আমেরিকায়। সুশোভনদা এখন একেবারে ঝাড়া হাত পা। সল্টলেকের বাড়িতে উনি একাই থাকেন। ওখানে ফোন করে লাভ নেই।

'আরে জয়দেবদা, আপনি এখানে?'

পাশ ফিরে জয়দেব দেখল, কণিষ্ক হাজরা। ম্যুরাল-এর কাজে ইদানীং খুব নাম করেছে। সুশোভনদা এই ছেলেটাকে নিয়ে ওর পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলেন মাস ছয়েক আগে। তখনই কণিষ্কের সঙ্গে আলাপ জয়দেবের। ও বলল, 'সুশোভনদা আসবেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ দিকে?'

কণিষ্ক বলল, 'আমি এসেছিলাম আর্ট কলেজে। যাব ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক হোটেলে। বাংলাদেশের এক নামকরা আর্টিস্ট কলকাতায় এসেছেন। কবিরুল ইসলাম, থাকেন প্যারিসে। উনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। ভালই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাল ফোনে সুশোভনদার কথা কবিরুল জানতে চাইছিলেন। নেট-এ ওঁর লেখা পড়ে ভীষণ ইম্প্রেসড। সুশোভনদা কি এখন আসবেন?'

জয়দেব বলল, 'আসার কথা তো ঘণ্টা খানেক আগে। কী হল, কে জানে?'

কণিষ্ক বলল, 'বোধহয় কোথাও ফেঁসে গিয়েছেন। ধর্মতলায় রোশনি বার-এ গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। এই সময়টায় মাঝে মাঝে সুশোভনদা যান ওখানে। দেখা হলে কবিরুলের কথা সুশোভনদাকে বলবেন। আজ আমার একটু তাড়া আছে। চলি জয়দেবদা। পরে দেখা হবে।'

পা চালিয়ে চলে গেল কণিষ্ক। আর দাঁড়িয়ে থাকার উৎসাহ পেল না জয়দেব। হাঁটতে হাঁটতে ফের ও জওহরলাল নেহরু রোডের ক্রসিং-এ এল। কলেজ স্ট্রিটেই ফিরে যাবে। সুশোভনদার লেখাটা পাওয়া গেল না। কিন্তু পত্রিকার ইস্যু তো আর থেমে থাকবে না। পাতা ভরাট করতেই হবে। নতুনদের লেখা প্রচুর গল্প দপ্তরে পড়ে থাকে। আজই তার মধ্যে থেকে একটা বেছে, প্রেসে পাঠিয়ে দিতে হবে। আনমনা হয়েই ও জওহরলাল নেহরু রোড ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। ফুটপাতে হকারদের ভিড়। রাস্তা দিয়ে বাস, মিনিবাস আর ট্রাকে করে লোক যাচ্ছে স্লোগান দিতে দিতে। তা দেখে, জয়দেবের মনে পড়ল, কার্জন পার্কে কোনও একটা পার্টির যেন মিটিং ছিল। মিটিং বোধহয় ভেঙে গিয়েছে। লোকজন তাই ফিরে যাচ্ছে। অফিসও ছুটি হতে শুরু করেছে। এই সময়টায় ট্যাক্সির আশা করে লাভ নেই। তারচেয়ে পাতাল রেলে করে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত চলে যাওয়া ভাল। তারপর না হয়, একটা রিকশা অথবা ট্রামে করে ও সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে গ্র্যান্ড হোটেল পেরিয়ে জয়দেব দেখল, সামনেই এসপ্ল্যানেড স্টেশন। দেখে, জয়দেব পাতাল রেলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

আর তখনই সামনে থেকে কে যেন ওকে ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে রেলিংটা ধরে না ফেললে, জয়দেব সিঁড়ির কয়েক ধাপ গড়িয়ে পড়ত। নিজেকে সামলে ও দেখল, ধাক্কায় কাঁধের ব্যাগটা নীচে পড়ে গিয়েছে। সিঁড়ির ওপর পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা ছড়িয়ে। তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠতে গিয়ে যে ওকে ধাক্কা মেরেছে, সে বাইশ-তেইশ বছর বয়সি একটা ছেলে। লজ্জিত মুখে সে সিঁড়ি দিয়ে ফের নীচের দিকে নেমে আসছে। তারপর উবু হয়ে পাণ্ডুলিপির পাতা জড়ো করে, ছেলেটা বলল, 'মাফ করবেন। আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

এই বয়সি ছেলেরা সাধারণত উদ্ধত হয়। মাফ চাওয়ার ধার-টার ধারে না। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেবের বিরক্তি উবে গেল। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। খুব ফরসা। মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি। বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ। কাঁধের ওপর নেমে এসেছে লম্বা চুল। পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি, আর নীল জিনসের ট্রাউজার্স। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, ছেলেটার



পিছনে সাদা আলোর একটা বলয় দেখা যাচ্ছে। ওকে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়দেব বলল, 'না, না। ঠিক আছে। মাফ চাওয়ার কিছু নেই। ভিড়ের মাঝে...হতেই পারে।' শুনে ছেলেটা যেন নিশ্চিন্ত হল।

প্ল্যাটফর্মে গিয়ে জয়দেব কিন্তু ছেলেটার কথা ভুলে গেল। ওর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল সুশোভনদাকে ঘিরে। এমএ পড়ার সময় থেকেই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সুশোভনদার লেখার সঙ্গে ও পরিচিত ছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ হয় এক টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে গিয়ে। গত দেড় বছরে সুশোভনদার সঙ্গে আলাদা একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জয়দেবের। বোহেমিয়ান টাইপের মানুষ। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যান। তারপর দিন পনেরো-কুড়ি বাদে ফিরে, ফোন করে বলেন, 'একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট আছে। তুমি ছাপবে?'

না করার কোনও কারণই নেই। জয়দেব যত্ন করে সেইসব লেখা ছেপেছে। বার দু'তিনেক উনি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে ওর বইয়ের দোকানেও এসেছেন। তখন গল্প করতেন, 'দেখবে, কলকাতায় আর্ট গ্যালারির সংখ্যা অনেক বাড়বে। তখন সুবিধে হবে আর্টিস্টদের। এখন যেসব আর্টিস্ট খেতে পায় না, তারা তখন দু'হাতে টাকা কামাবে। কেন জানো? আর্ট ওয়ার্ক কালেকশনের হ্যাবিট ক্রমশ লোকের মধ্যে বাড়ছে। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করবে পেন্টিং-এ। যে টাকায় কিনবে, তার দ্বিগুণ দামে বিক্রি করবে বিদেশে।' সুশোভনদার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে।

পাতাল রেলের ট্রেনে ওঠার পর, জয়দেবের হঠাৎই মনে হল, আরে...সুশোভনদা কোনও বিপদের মধ্যে পড়েননি তো? ইদানীং উনি সপ্তাহে তিনদিন করে মিউজিয়মে যাচ্ছেন। এই বুদ্ধমূর্তিটা চুরি যাওয়ার পর থেকে, কর্তাদের হঠাৎ টনক নড়েছে। মিউজিয়মের স্টোর রুমে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও মূল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী অনাদরে এদিক-ওদিক পড়ে আছে। সেগুলো গুছিয়ে দেওয়ার জন্য তো বটেই, দাম ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণের জন্যও, পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ একটা কমিটি গড়েছেন। সেই ফিজিকাল ভেরিফিকেশন কমিটিতে আছেন সুশোভনদা। মিউজিয়মের চারতলায় বসে ওঁরা পাঁচজন এখন, যে যাঁর বিষয়ে ক্যাটালগ তৈরি করছেন।

হয়তো সুশোভনদা ওই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসের মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন, যা চাঞ্চল্যকর! হয়তো, সেটা নিয়ে উনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিউজিয়ম ঘিরে থাকা দুষ্টচক্র টের পেয়ে গিয়েছে। সেই চক্র হয়তো চায় না, লেখাটা বেরক। তারা সুশোভনদার ক্ষতি করে দিতে পারে। সুশোভনদা কি এই চক্রের কথাই সকালে বলছিলেন? না হলে কেন উনি বললেন, কেউ ওঁর ফোনটা ট্যাপ করছে? কেন উনি বললেন, ঝুঁকি নিয়েই লেখাটা দিতে চান? কাউকে উনি ভয় পান না। সকালে ওঁর সঙ্গে ফোনে যেসব কথা হয়েছিল, তা মন দিয়ে ভাবতে লাগল জয়দেব।

সুশোভনদা বলেছিলেন, 'তুমি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছ, সেই বিষয় নিয়েই আমি লিখতে চাই।' তার মানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে। এমএ পাশ করার পর থেকে এই বিষয়টা নিয়েই তো জয়দেব ডুবে আছে। গবেষণা করছে গোপনে। খুব অল্প মানুষই জানেন সেকথা। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে কলকাতার জাদুঘর থেকে সুশোভনদা কী এমন আবিষ্কার করলেন, যা নিয়ে হইচই পড়ে যাবে? মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য জটিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই রহস্য যাঁরা উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের অনেকেরই জীবনসংশয় হয়েছে। সেই কারণেই, জয়দেবের এত গোপনীয়তা, সাবধানতা। গত চার বছরে অন্তত বার দশেক ও পুরীতে গিয়েছে। চেষ্টা করছে, সত্য উদ্‌ঘাটনের। একবার মারাত্মক বিপদেও পড়েছিল, ভুবনেশ্বরে খোঁজখবর করতে গিয়ে। খুব ভালভাবেই তখন ও টের পেয়েছিল, মহাপ্রভু পাঁচশো বছর আগে অপ্রকট হয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও একটা চক্র সক্রিয়। তারা পছন্দ করে না, বিষয়টা নিয়ে কেউ আর আগ্রহ দেখাক।



এসব কথা ভাবতে ভাবতেই জয়দেব মহাত্মা গান্ধী স্টেশনে পৌঁছে গেল। পাতাল রেল থেকে ওপরে উঠে, হাঁটতে হাঁটতে ও যখন ট্রাম লাইনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। পকেট থেকে সেটটা বের করে, সুইচ অন করতেই ও দেখল, সুশোভনদার নাম। উত্তেজনায় জয়দেব বলে উঠল, 'আরে, কী হল সুশোভনদা, আপনি কোথায়?'

পরের এপিসোড আগামী রোববার

অলংকরণ শান্তনু দে



শুরু হল নতুন কলাম। ব্র্যান্ডবাদশার নামরহস্য

ডাকনাম কোক। জগৎসুদ্ধু আদর করে এই নামেই একে ডাকে। কোকাকোলার জন্ম গত শতকের শেষদিকে। আমেরিকার এক শহর, আটলান্টা—এর আঁতুড় ঘর। জনপ্রিয়তম এই নরম পানীয়টির জনক একজন ফার্মাসিস্ট। জন এস পেমবারটন। তবে কোকাকোলার জন্ম নরম পানীয় হিসেবে নয় কিন্তু। এর পেটেন্ট প্রথমে নেওয়া হয়েছিল ওষুধ হিসেবে। পরবর্তীকালে কোক গোটা বিশ্বের নরম পানীয়ের জগতে রাজত্ব করতে শুরু করে। আজও এর সে মুকুট অক্ষত। কোকাকোলার লোগো যিনি তৈরি করেন, তিনি কোনও বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না। নিতান্ত অ্যামেচার। সাধারণ মানুষ। তাঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন রবিনসন। পেশায় ছিলেন পেমবারটনের পার্টনার এবং গ্রন্থাগারিক। ১৮৮৫ সালে কোকাকোলার লোগো ডিজাইন করেন তিনি। মনে করা হয়, ব্যান্ড-কোকের এই লোগোই আজ পর্যন্ত তৈরি হওয়া সেরা লোগো। আমেরিকা দেশটা আসলে যৌবনের দেশ। যৌবন ছাড়া অন্য কোনও বয়েসকে এদেশ পরোয়া করে না। এদেশের সর্বত্র যৌবনের বাঁধভাঙা ডাক। সেই তারুণ্য, সেই উচ্ছ্বাসকে মাথায় রেখেই কোকের লোগোর নকশা করা হয়েছিল।

'কোকাকোলা' শব্দটিতে মোট তিনটি 'সি' আছে আমরা সবাই জানি। রবিনসন লোগোতে দু'টি 'সি'-এর ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। দু'টি 'সি'কে বড় করে দেখিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের কথা তাঁর মাথায় ছিল। বড় অক্ষরের দু'টো 'সি' যে বিজ্ঞাপনে ভাল দেখাবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। কোকের লোগোর ওই দু'টি বড় 'সি'-ই যে সবচেয়ে বেশি জনগণের চোখে পড়ে, তা নিয়ে আজও কোনও দ্বিমত শোনা যায় না। লোগোর করসিভ হরফগুলো অন্যরকম। একে বলা হয় স্পেনসারিয়ান লিপি। সে আমলে, আমেরিকার কেজো লেখাপত্তরে স্পেনসারিয়ান লিপির প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে। এর প্রচলন উনিশ শতকেই শুরু হয়। তবে মাঝামাঝি সময় থেকে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোকের থেকে এটি সামান্য বেশি বয়েসি। রবিনসন এই প্রচলিত হাতের লেখা পদ্ধতিকে লোগোর নকশায় ব্যবহার করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাক্ষর রেখেছিলেন। সে সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোক-লোগো অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই স্পেনসারিয়ান হরফ ব্যবহার করার জন্য।

পরবর্তীকালে কোকের লোগোর নানারকম বদল হলেও এই হরফগুলোকে কখনও পাল্টানো হয়নি। লোগোতে লাল রং-কে তীব্রভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তারুণ্যের উদ্দামতার কথা ভেবে। উষ্ণ লাল এবং সাদা—এই দু'টি রং মিলেমিশে ভারি আকর্ষক রসায়নের সৃষ্টি হয়েছে। বছর, দশক এমনকী শতক ঘুরেও যার মোহিনীশক্তি অম্লান। তবে লোগো তৈরির বেশ কিছু বছর পরে এর প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, আটলান্টা জার্নাল নামে এক পত্রিকায়। ১৯১৫ সালে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই এই লোগোর মুখ দেখা যায় পেমবারটনের ফার্মেসিতে। বিজ্ঞাপন বের হওয়ার অনেক আগেই অবশ্য রবিনসনের তৈরি লোগো, কোকের ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়ে গিয়েছিল। সেই ১৮৮৭ সালেই। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোকাকোলার কর্পোরেট পরিচিতি এর বিখ্যাত লোগোটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোকের লোগোর কথায়, এর ভুবনমোহিনী বোতলটির উল্লেখ না করলে গোটা ব্যাপারটা যেন আলুনি রয়ে যায়। বোতলের নকশাতেও তারুণ্যের প্রভাব জোরালো।

ইন্ডিয়ানার রুট গ্লাস কোম্পানি ১৯১৫ সালে সুন্দর মেয়েলি বিভঙ্গের বোতলটি তৈরি করে। সামান্য খাঁজসমেত কাচের বোতলটিকে রসিকজন 'হব্‌ল স্কার্ট বটল' নামে ডাকতে ভালবাসতেন। 'হব্‌ল স্কার্ট' মানে কম ঘেরের স্কার্ট। সঙ্গত কারণেই এই বোতলরূপী ইভের আবেদন ও আকর্ষণ আমাদের কাছে চিরন্তন। ঠান্ডা মতলবে নকশা আঁকে কোকাকোলার লোগো।

অদিতি বসুরায়




taste _________
Music CDs
O&M 014
coming soon